প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

মুদ্রক : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

আজকের কবিতা

অনেকদিন আগে 'আজকের গল্প' নামে একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলুম আমি। উদ্দেশ্য ছিল একেবারে সাম্প্রতিক কালের তরুণ-তরুণীদের সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন দিক পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। সেই সময়ই ভেবেছিলুম, কবিতারও এই রকম একটি সমসাময়িক চিত্র তুলে ধরলে বেশ হয়। এতদিনে সেটি সম্ভব হলো।

সাহিত্যের কোনো বিচারক হয় না। ভালো মন্দের ব্যাপারে রায় দেবার অধিকারী আমি নই। তা ছাড়া, পূর্ববর্তী কালের সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ যদি বা সম্ভব হয়, পরবর্তীকালের সম্পর্কে সে সুযোগ নেই, কারণ তা প্রবহমান এবং অসম্পূর্ণ। অনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক তফাৎ হয়ে যায়। এক হিসেবে আমি মুক্ত পুরুষ, আমার পূর্ব সংস্কার নেই। কবিতা পাঠ করা আমার নেশা, বাংলা কবিতা আমি অনর্গল পড়ে যাচ্ছি, আমার চোখের সামনে আসেও অজস্র, তা থেকে আমার পছন্দ-অপছন্দ একান্ত নিজস্ব। এই সংকলনে অবশ্য কবিতা সংগ্রহ এবং নির্বাচনে আমায় বিশেষ সাহায্য করেছেন সহোদরোপম অনুজ কবি শ্রীযুক্ত সুব্রত রুদ্র।

বিতর্কের অতীত কোনো সংকলন আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে কি না আমি জানি না। এই সংকলনেব নির্দিষ্ট সীমারেখা এই: আমাদের সময়কার এবং পূর্ববর্তীগণ অনেকেই এখনো রীতিমতন সমসাময়িক কবি নিশ্চিত, কিন্তু এখানে আমি গ্রহণ করেছি আমাদের চেয়ে তরুণতর কবিদেরই রচনা। শুধু বয়েসের বিচারে নয়, কাব্য জগতে যাঁরা নবীন। একেবারে সদ্যযুবক, যাকে বলে বাচ্চা ছেলে, এমনও কয়েকজনের লেখা নিয়েছি, কারণ তাঁদের লেখা পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। অবশ্য এ তালিকার কোনো শেষ নেই। অতি পরিচিত কিংবা অধিক ক্ষমতাবান কোনো কবির নাম বাদ পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। উৎসব বাড়িতে নিমন্ত্রিতেন তালিকা রচনা করার সময় অনেক সময় অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম লেখার কথাই মনে পড়ে না। সে রকম ত্রুটি থাকবেই, এবং বইটিকে এক জায়গায় শেষ করতেই হবে। ভুল-ত্রুটির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাই।

কলকাতা ছাড়া বিভিন্ন ছোট শহরে আমি গিয়ে দেখেছি, সে রকম অনেক শহরেই একদল শক্তিমান তরুণ কবি রয়েছেন। যোগাযোগের অসুবিধের জন্য কলকাতার প্রকাশনা জগতে ঠিক মতন প্রতিনিধিত্ব পান না তাঁরা। সে রকম কয়েকজনের কবিতা আমি এই সংকলনে নিয়েছি, আরও নেওয়া উচিত ছিল এবং এ জন্য দুঃখ রয়ে গেল।

জীবনের প্রথম কবিতা রচনা শুরু করার আগেই অনেকেই সাদা দেওয়ালের সামনে একলা দাঁড়িয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। পরবর্তী জীবনে তারা আর লেখে না, হারিয়ে যায়। এই সংকলনেরও কিছু কবি থাকবেন, কয়েকজন হারিয়ে যাবেন। যারা হারিয়ে যাবে, তারাও বাংলা কবিতায় অন্তত একটি শব্দের আলো কিংবা একটি পংক্তির দ্যুতি অন্তত রেখে যাবে, আমি এমন আশা করি।

"আজকের কবিতা"র মতন আজকের বাংলা গল্পেরও একটি পরিমার্জিত, পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংকলন আমি সম্পাদনা করছি, যা প্রকাশের অপেক্ষায়। এ ছাড়া, কিছুদিন আগেই বেরিয়েছে 'আজকের হিন্দী গল্প'। কবিতার এই সংকলনটির পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি সদ্য আগত এবং অনাগত কবিদের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই মুহূর্তে খুব কষ্ট থেকে যাচ্ছে মনে, স্থানাভাবে অনেক কবি রয়ে গেলেন বাইরে। এ জাতীয় কোনো সংকলনই সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত হয় না।

ইচ্ছে ক'রে কবিদের বয়েস বা অন্য কোনো পারম্পর্য রক্ষা ক'রে কবিতাগুলি সাজানো হয়নি। যে কোনো কবিতা থেকেই এ বই পড়তে শুরু করা যেতে পারে।

কোন্ কবিতা কোথা থেকে সংগৃহীত তার উৎস দেওয়া হ'লো সবশেষে।

সুব্রত রুদ্র

সূচীপত্র

তুষার রায়

দেখে নেবেন

বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে
ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা।

এখন আমার কোন কষ্ট নেই, কেননা আমি
জেনে গিয়েছি দেহ মানে কিছু অনিবার্য পরম্পরা
দেহ কখনো প্রদীপ সলতে ঠাকুর ঘর
তবু তোমরা বিশ্বাস করো নি
বার বার বুক চিরে দেখিয়েছি প্রেম, বার বার
পেশী অ্যানাটমী শিরাতন্ত্র দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ,
গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার
রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিল কিনা।

ব্যাণ্ডমাস্টার

আমি অঙ্ক কষতে পারি ম্যাজিক
লুকিয়ে চক ও ডাস্টার
কেননা ভারী ধুন্ধুমার ট্রাম্পেট বাদক ব্যাণ্ডমাস্টার,

তখন প্রোগ্রাম হয় নি শুরু—সারা টেম্পল নাম্নী ক্যাবারিনা
তখন এমনি বসে ডায়াসের কোণে,

আমি ড্রামে কাঠি দেওয়ামাত্র ওর শরীর ওঠে দুলে,
ড্রিরি—ড্রাঁও স্ট্রোকেতে দেখি বন্যা জাগে চুলে,

তিন নম্বর স্ট্রোকের সঙ্গে নিতম্বেতে ঢেউ
চার নম্বর স্ট্রোকেতে ঝঞ্ঝা ওঠে গাউনের ফ্রীলে,
নম্বর পাঁচে শরীর আলগা, বুকের বাঁধন ঢিলে,
আমি তখন ড্রাম বাজিয়ে নাচাই ওকে
মারি এবং বাঁচাই ওকে,
ড্রামের কাঠির স্ট্রোকে স্ট্রোকে
যেন গালাই, এবং ঢালাই করি
শক্ত ধাতু নরম করার কাস্টার,
কেননা ভারী ধুন্ধুমার ট্রাম্পেট বাদক ব্যাণ্ডমাস্টার।
আবার বাজাই যখন ম্যাক্সো চেলো
ক্যাবারিনার এলোমেলো
ডিভাইস এ দ্বন্দ্ব এলো!

আমার বাঁশীর সুরের সুতোয়
দেহের ফুলে মালা
ট্রা রালা লি রালা লা
ঠিক চাবি হাতে দেখি খুলে যায় তালা।

যোগব্রত চক্রবর্তী

আবহমান বাংলা

চলো যাই
চলো দেখে আসি
কি করে ভাইয়ের পাশে ভাই
রক্তে ভিজিয়ে দিচ্ছে মাটি
'চলো যাই চলো দেখে আসি।'

জন্মভূমি ছেড়ে আসা
কোন এক চৈত্রের দুপুরে
বহুকাল ব্যবধানে মা আমার দুয়ারে আবার···
আমি উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিই
মা বলেন অভিমানে :
এতকাল ভুলে থাকা কখনও কি ছেলেকে মানায়?

মাকে

বুকের মাঝে খুন দেখে চমকে উঠেছিলাম
মাগো আমার মা
নষ্ট ফলে মুখ দিয়ে আজ জীবন হারালাম।

সোনার বর্ণ কালি হল
মুখের কোণে ফেনা
মাগো, আমি ঠিকানা
আজও জানি না···।

তোমার কথা জীবনে আমি কখনো শুনিনি
তোমার কান্না যেখানে যাই আজও নিখুঁত শুনি
একশোবার বলো তুমি আমায় ভালো হতে
কে যে ভালো কে যে মন্দ বুঝাতে পারি না যে।

আমার ওপর ছিলো না কি তোমার অনেক আশা
স্বপ্ন বলো সত্যি কি হয় বৃথাই দুরাশা
পাঁচটা বীজ কখনো কি একই ফসল দেয়
আমি তোমার নষ্ট ফসল সেটাই ধরে নাও।

এখন আমি স্বজন হারা বিজন পরদেশে
তোমার কোলে শুতে আমার ইচ্ছা ভীষণ কি যে
সর্ব অঙ্গ কালো হল ঠোঁটের কোণে ফেনা
আমার রক্তে আজও আমার পিপাসা মিটলো না

মাগো আমার মা
সমস্ত দিন অঝোর ধারায় বৃথাই কাঁদালাম।

শৈলেশ্বর ঘোষ

ক্রূর অভিনয়

কোন শীতের রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে আমার যাবার
সময় হবে, পড়ে থাকবে কিছু আধ-পোড়া সিগারেট
ছাই, ছেঁড়া জামা, অভুক্ত খাবার, ধূসর পাণ্ডুলিপি
ইস্ত্রিবিহীন পাজামা পরে নেব, মনে পড়বে সেই কথা
এ কোন বিদায় নয় কেবল অসমাপ্তের আত্মগোপন

যদি আঘাত, তাও আসবে এই বুকে আমার
যদি ভালবাসা তাও জাগবে এই বুকে
যদি ঘৃণা আসে পান করে নেব সব
সকলের সন্দেহ পরীক্ষা করে নেবে শরীর চরাচর
হৃদয়ের শূন্যস্থান এইভাবে পূরণ হয়ে গেলে
ধরা পড়ে যাব, অস্বীকারের উত্তেজনা ভোগ
করতে দেখে খুন করবে যে সে আমারই বিরোধী
যখন ফিরে আসব পৃষ্ঠপোষক এই জনতার শহরে
চিনতে পারবে না কেউ কিন্তু সকলেই বলবে
'এ তো সেই, আগাগোড়াই ছিল কিছু খাটো
আমাদের চেয়ে এবং পুলিশ এরই মাথার জন্য
প্রত্যেককে আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশী
দিতে চেয়েছিল'—কান্নার জন্য সেটাই হবে
যথেষ্ট বিষয় —আর এই চোখ দেখবে না
কিছুই, ঘুমাতে চলে যাও তোমরা এবার একে একে
অপরাধ হয়নি কিছু দেখতে যাচ্ছ ঠাণ্ডা মাংস ধমনী মৃত
এ কোন ফেরা নয় বা গৃহত্যাগের পর নয় বিদায়
সংশোধনমূলক শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাত হাতে আছে
আমাদের সুতরাং নিরাপত্তার জন্য বেজে উঠবে
পাগলাঘণ্টি এবং শুরু হবে ক্রূর অভিনয়
অভিনয় শেষ হলে অবশ্য সকলেই চিনতে পারে, বলে,
'কিছু মনে কোরো না আমরা আন্তরিকভাবেই দুঃখিত !'

জয়গর্ব

শেষ দিনে খুনী লিখে রাখছে কপালে তার, 'জানতে চেয়েছিলাম
ছিল-কি-না-ছিল ভালবাসা হৃদয়ে আমার' মধ্যরাত্রে বাবা
মাকে খুন করতে গেলে, সেও তার বাবাকে খুন করবে ভেবেছিল,
একটি মেয়েও একদিন চীৎকার করে বলেছিল, 'প্রাণ বাঁচাও
আমি তো তোমাকেই ভালবাসি !'—শেষ রাত্রির নক্ষত্র
মাথার উপর, পুলিশের টহল, ঝিঞ্জির নিবদ্ধ প্রাণ,
খুনী জানতে চাইছে 'কে কে বলেছিল আমি খুনী,
আমি তাদেরও খুন করতে চাই' যে পাখি ঘুমায় না সেও
সেদিন ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল—জানি এই সারাংশ-সহ
পার হতে পারব না, এই আমার জয়গর্ব, যতক্ষণ জেগে
আছি ততক্ষণ ভুলতে হবে না কিছু—করোটি কপালে
প্রবেশ ও প্রস্থান ছাড়া আর কিছু লেখে না, খুনী আমি,
যাদের খুন করেছি ভালবেসে তাদের সঙ্গেই রয়ে গেলাম
ছিল-কি-না-ছিল ভালবাসা শুধু এই জানতে চেয়েছিলাম !

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সাহিত্য একাডেমিকে খোলা চিঠি

পোষকতাই আপনাদের ধর্ম, সদস্যবৃন্দ !
চোখ কান যদি খোলা রাখেন আর সঙ্গে যদি যোগ করে দেন ঈষদুষ্ণ
বিবেচনাবোধ, তবে সাতদিনের মধ্যেই পুরস্কারটি দিয়ে দিতে পারেন !

এখনো উৎসাহ ফুরিয়ে যায়নি, এখনো যদি হাতে একখানা কুড়ুল পাই
অনায়াসে কাঠ চিরতে পারি, এবং দিগ্‌দিগন্তে আগুন
ধরিয়ে দিতে পারি।

আপনারা জানেন না, আজ সকালে আমার দুই ভাগনের মধ্যে
দুর্দান্ত ঠেলাঠেলি হ'য়ে গেছে, বারান্দায় একফালি রোদ এসেছিল,
কে আগে দাঁড়াবে,—সদস্যবৃন্দ, তাদের গরম জামা নেই।

ষাট না পেরোলে, ট্রামচাপা না পড়লে, নিজেকে ছড়িয়ে ফের কুড়িয়ে নিতে
না পারলে, আচার্যবর্গ, আপনাদের মনোযোগ পাই না, কিন্তু এই সবই
যদি একসঙ্গে কিংবা আলাদাভাবে ঘটে—আপনাদের পুরস্কার
উপরিপাওনা মাত্র। ঘাটের মড়ার বাঁধানো দাঁতে যদি পাঁচহাজার টাকার
চেক তুলে দেন, চিবিয়ে কোনো
রস পাবো না, মহোদয়গণ!

পরিকল্পনার নোটের টাইপ বাণ্ডিলগুলো চোখের সামনে দিয়ে
ভেসে যাচ্ছে নর্দমায়, অবশিষ্ট প'চে উঠছে
চোরাই ইঁদুরের গর্তে; একদিকে বিলিতি মদে-ডোবানো সলতে জ্বলছে
হাজার হাজার, অন্যদিকে কঙ্কালসার অমাবস্যায় হন্যে হ'য়ে ঘুরছে
লক্ষ লক্ষ ভিখারী,···বরং যারাই লিখছে এবং ছাপছে তাদের প্রত্যেককে
একটা ক'রে পুরস্কার দিন—এক আধটা জামা কাপড়, দু'একদিন ভালোমন্দ
খাবার,—ভবিষ্যতে যারা নিজেকে এবং কাউকে ধোঁকা দেবে না, তারা
ঐ টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে
সশব্দে ফিরিয়ে দেবে।
হে তৈলপিচ্ছিল-হস্তিদন্তস্তম্ভারোহীবৃন্দ, নিম্নে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করুন,
দেখবেন সারিবদ্ধ লাল পিঁপড়ে কেমন তরতর ক'রে গম্বুজের গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে
একটু সাবধানে থাকবেন, বড্ড কামড়ায়।

দেখুন, একটু নুন দিয়ে ভুট্টার জাউ কেমন সুস্বাদু হয়, কচু শাকও কেমন
ভিটামিনযুক্ত, আর তৎসহ দৃকপাত করুন···চারিদিক কেমন থমথমে,
মুখ তুলে করুণ চীৎকার করছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে,
দেখতে পাচ্ছেন, কেমন কালো মেঘ স্তরে স্তরে ঘনিয়ে আসছে,
প্রচণ্ড বজ্রপাত হ'তে পারে।

সময় মাত্র সাতদিন ! কিন্তু ঠিক সাতদিনের মাথায় সমস্ত কলম
যদি দিকে দিকে খরশান আক্রোশে ঝলসে ওঠে, তখন
কে কাকে পুরস্কার দেবে, সদস্যবৃন্দ !

আবার, যে কোনো দিন

কথা ছিলো আমাদের পরস্পর কথাবার্তা হবে।
তারপর বহুদিন কেটে গেলো গভীর নীরবে,
ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে রুদ্ধশ্বাস ভাতৃঘাতী ঋণ
রক্তধারা ধুয়ে মুছে যথারীতি এসেছে আশ্বিন,
যথারীতি লালবাড়ি জানলা খোলা নদীর ওপারে
উলঙ্গ শিশুরা খেলে নোংরা কাঁচা নর্দমার ধারে,
বঙ্গোপসাগর থেকে বৃষ্টি আসে অজস্র কণায়
পুলিশী হামলার পর এ শহরে অরণ্যের স্তব্ধতা ঘনায়,
তবুও আকাশে ওড়ে শরতের ছিন্নভিন্ন হাঁস,
এ আকাশে মেঘ নেই আলো নেই কেবল আকাশ।

কথা ছিলো পরস্পর মুখোমুখি কথাবার্তা হবে,
জাগাবো প্রবল প্রাণ ভারতীয় পচা বাসি শবে,
মানুষ ফিরিয়েছিলো মানুষের দিকে কিছু মুখ,
যথেষ্ট ফেরেনি তাই কাটে নাই আকাল, অসুখ ;
বরং বেড়েছে নিত্য মানুষের মহিমাবর্জিত
ক্ষুধা ও ক্লান্তির দিকে পরস্পর ক্ষুধার অসুখ।

এবং ভিতর থেকে মাঝরাতে এসেছিলো যুবক ন'জন
রাত্রির দরজা খুলে বলেছিলো 'এক্ষুণি চলুন'
যেহেতু আমার মধ্যে ওত পেতে বসেছিলো হারামি ও খুন
চর্ব্যচোষ্য চোট্টামিতে ডুবে গেলো আত্মীয়স্বজন।

এখনো ছুটির পরে ভাঙাচোরা লোক আসে ঘরে
নীলাভ বিদ্যুৎ খেলে ঘাড়-নিচু মাথার ভিতরে
গঙ্গায় ইলিশ নেই, আছে কিছু টাকার কুমীর
মাঝরাতে উঠে আসে মুখ মুছে নেমে যায় ভোরে
ল্যাজের ঝাপটায় কাঁপে লোকালয়, কেবল কাঁপে না তিতুমীর
জোরালো দড়ির ফাঁসে লটকে যাবে সমস্ত কুমীর।
হাত-পা ডুবেছে কিন্তু চোখ খোলা, আর আছে মাঝারি বিবেক
একমাত্র সেই শর্তে একদিন তুলকালাম হবে অভিষেক
সেই শর্তে আমাদের পরস্পর কথাবার্তা হবে
আপাতত দিন যায় রাত্রি যায় কঠিন নীরবে।

রত্নেশ্বর হাজরা

বিচ্ছিন্ন সংলাপ

তুমি কার উত্তোলিত বুক তরবারির ফলায়
আড়াআড়ি রাখো ? কার
নগ্ন বাহুমূল থেকে তারা খসাও!
কোন্ কৃষ্ণকুমারীর চোখ লবণাক্ত ? কার
দীর্ঘশ্বাসের জন্য বাতাস
অপেক্ষমাণ!
আমি কারুর উত্তোলিত বক্ষ
নগ্ন বাহুমূল
তরবারির ফলায় আড়াআড়ি বুকের অহংকার
আলেয়ার জন্য জলাভূমি
দেখতে চাইনি, আমি কারুর
দীর্ঘশ্বাসের জন্য বাতাস ছুঁয়ে
দাঁড়াতে চাইনি, আমি কোনো

কৃষ্ণকুমারীর চোখের লবণে তৃতীয় ঋতুর শরীর
ডুবিয়ে দিইনি। আমি কারুর
প্রাচীনতম মদের পাত্র ভেঙে দিইনি।
তুমি কোন্ সমুদ্রতীরের বায়ুতে রমণীর রক্ত লবণের গন্ধ
মিশিয়ে দাও ?
কোন্ তীব্র আলোতে নিজের মুখ
নিরীক্ষণ করো ! দু'হাতে তুলে ধরে
কার উত্তোলিত বুক
তরবারির ফলা
নগ্ন বাহুমূল আমার দিকে
ফিরিয়ে দাও ? আমি তো কোনো
কৃষ্ণকুমারীর চোখের লবণ প্রাচীনতম মদের পাত্রে
দেখতে পাইনি !

বর্ণপরিচয়

ঘুরে গেলেই একটা ফাঁকা। আমি ফাঁকার মধ্যে দাঁড়িয়ে
মুঠো থেকে **প** ছুঁড়ে দিই। **প** থেকে পৃথিবী এবং প্রশ্ন
প্রতিবাদ প্রতিশোধ এবং প্রেম ছড়িয়ে পড়ে—পড়তে পড়তে
প্রহর চলে যায়—

প্রেম শব্দে প্রভুর চেয়ে প্রেমিকা সহজ—যেহেতু প্রেম
সহজাত কবচকুণ্ডল সহজাত মৃত্যুবোধের সমান
যাকে চেনার ঢের আগে আমাকে **ম** নামক অক্ষর
শিখতে হয়েছে
ম থেকে মধু মধু বাতা ঋতায়তে
মধুক্ষরতি মৃত্যু—আমি মৃত্যুকে দেখি কিন্তু চিনতে পারি না-

ছেলেবেলায় **চ** অক্ষর শিখতে শিখতে কেউ চাঁদ হয় কেউ চন্দন
আমি চাতক হয়ে যেতাম চিহ্ন থেকে চিহ্নহীন একা—
জ-এর উপর জাহাজ ভাসতো নদী পেরিয়ে সমুদ্রে
আমি জল চিনতাম

জল চিনতে চিনতে জন্ম

জন্ম চিনতে চিনতে

আমি মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

বিন্দুর মতো চিহ্ন থেকে চিহ্নহীন—

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

একা হ'য়ে পড়ছি

ক্রমশই একা হ'য়ে পড়ছি

জয়ের পথে একা পরাজয়ের পথে একা

একার এই পৃথিবী জুড়ে আমার বাসা আমার দিনরাত্রির বাসাবদল
মুকুট থেকে পালক রঙবেরঙের পালক পড়ছে খ'সে
খ'সে পড়ছে ধুলোয় খ'সে পড়ছে ধাবমান অমোঘ হাতের উপর
নির্জন অন্ধরাত্রির শীতল গহ্বরে সেই অমোঘ হাত ফিরিয়ে দিচ্ছে আবার
হাত বাড়ালে চৈত্রের উদাস দুপুর

হাত বাড়ালে হেমন্তের বাউল বিকেল

আমি পাগলাঝোরা নদীর সঙ্গে একা একা গল্প করি

চলার গল্প চলতে চলতে থেমে যাবার গল্প

পরান-মাঝির সঙ্গে সুখ দুঃখ বিনিময় তার একা হওয়ার গল্প

গর্ভকোষে নিহিত বীজকণা তাদেব শুভ্র পরিণাম নিয়ে জলন্ত আত্মাগুলি

কোলাহল ক'রে ওঠে

মূর্ত হবার আনন্দে   চরিতার্থ হবার স্বপ্নে তারা কোলাহল ক'রে ওঠে
ছড়িয়ে পড়ে   গর্ভকোষ ফাটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ায় একদিন
ছড়িয়ে পড়ে
তখন হয়তো শীত কিংবা গ্রীষ্ম সকাল কিংবা সন্ধ্যা জনতা কিংবা নির্জনতা
তারা চলে গেলে
আমি   সফল সদ্যপ্রসূজননী   নির্ভার নির্মুক্ত
হালকা হাওয়ায় শরীর ভাসিয়ে রেখে দারুণ একার সঙ্গে
দিনমান যাপন করি শব্দে
রাত্রি যাপন করি নিঃশব্দে
রেখে যাবার গোপন দুঃখে জ্বলতে থাকে শ্মশান চাপা
যাবার কিছু নেই জেনেই জ্বলতে থাকে

আমার মেয়ে

কবে যেন আমাদের বুক থেকে উড়ে গেছে কোন্‌দিকে অপরূপ ময়ূর ময়ূরী !
এইভাবে উড়ে যায় ?   তবে কেন এসেছিলো ?   এইখানে দীর্ঘদিন
যাপন করেছে, করে গেছে !
না কি তার জন্ম আমি নিজেই দিয়েছি ? তাকে লালন করেছি—
ভালবেসে ?
আকাশের বাটি থেকে নীল তুলে এনে তার শরীরে মেখেছি ;
তার চোখের মণিতে
নীলিমার স্থির স্বপ্ন, বিদ্যুৎ রেখেছি—তাতে বিবাদ ছিলো না,
বৃষ্টি ছিলো ;
সে কখন উড়ে গেছে—কোন্‌দিকে উড়ে যায়—যুবরাজ যেরকম যায়
প্রৌঢ়ের শরীর থেকে বের হয়ে, অবশেষে পোশাক ধুলোতে ফেলে—
উদাসীন যায়
সিংহাসন পড়ে থাকে, শেষহীন শূন্যতার প্রতীক যেনবা, স্মৃতিভারে……

পালিত ময়ূর ওই নেচে ওঠে পুনর্বার আমার মেয়ের
চোখে বা পায়ের ছন্দে, আঙুলের নীল নখে, গ্রীবার বাহারে ;
উদ্দাম বর্ষার ঋতু শরীরের ভাঁজে ভাঁজে মেঘ হয়ে জমে ;
সে যখন হেঁটে যায়, আমি তার বাহু দেখে ভুলে যাই
পেখমের স্বাভাবিক রীতি ;
আমার শরীর থেকে সে কখন উড়ে গিয়ে কিশোরীর শরীরে বসেছে !
তাহলে সে যায় না কি ? থাকে, বাসা বাঁধে—যার শরীর মেঘের ঋতু
বিদ্যুৎ, নীলিমা—ধরে আছে।

কেতকী কুশারী ডাইসন

সৃষ্টি

যা ছিলো সহজ তা যে কখন দুরূহতম হোলো !
খণ্ড অবসর পেলো পূর্ণতার দুর্লভ ইঙ্গিত,
জ্ঞানহীন বাতায়নে কখন চকিতে হাওয়া দিলো,
উদ্ভিদের নবজন্ম লাভ করলো রবীন্দ্রসংগীত।

সংগোপন দ্বন্দ্ব আনে অগ্নিবর্ণ রাত্রির সম্ভার,
বৃত্তনোরথ অঙ্গ নিত্য করে কেন্দ্র-অন্বেষণ,
মেঘকল্প সুন্দরের রাজতন্ত্রে নানা অত্যাচার,
স্ফুটগন্ধ অন্ধকারে বৃষ্টি খোঁজে আত্মসমর্পণ।

কক্ষচ্যুতি নয় কাম্য, অব্যাহত পথপরিক্রমা,
পাথরের অন্তরালে শ্রুতিগম্য ধ্বংসের প্রবাহ,
বৈনাশিক অভিসারে লগ্ন হয় দ্রুত অগ্রসর,
বৃথা মনে হয় ভাগ্য, খরস্রোতে হারায় উপমা।
কি স্নিগ্ধ এ উপাসনা, কি নিগূঢ় আন্তর প্রদাহ,
পূজার মুহূর্তে মূর্ত আরাধিত বিমূর্ত ঈশ্বর।

ছোট নদীকে

মেটেনি, মেটেনি কিছু, বেড়েছে কেবলই,
অথবা নিয়েছে জন্ম আগে যা ছিলো না,
ছোট নদী, তোর তীরে অশান্ত কাকলী
যে ভাবে ফুরালো তার নেই রে তুলনা।

আমাকে বুঝালি না নদী। সতেজ ডাঁটায়,
সকালের দূর্বাঘাসে অজস্র ফুটেছি,
তোকে ঘেঁষে কত বার পাতায় কাঁটায়
তোর এসরাজের স্বর বুঝতে চেয়েছি।

মেঘ-বৃষ্টি, সূর্য-সোনা, হিম-ঝরা হাওয়া,
উপহার আনে যারা অনুক্ষণ বুকে,
যুগল পথিকদের শ্লথ আসা-যাওয়া,
দিনের প্রার্থনা-দুঃখ রাত্রির সম্মুখে,

এদের চেয়ে কি কিছু কম তোকে টানি,
রাখিনি কি প্রীতিচিহ্ন তরল কপালে ?
আমি তার মুহূর্তের তারতম্য জানি
যে নিগূঢ় স্রোত বয় সংজ্ঞার আড়ালে।

ছলনা করিস না নদী। পাতিহাঁস হ'য়ে
ভিতরের দুঃখ ফেরে গুগলির পিছনে,
এদিকে সেদিকে খুঁজে, বহু স'য়ে স'য়ে
রূপহীন চিন্তা করে, ব্যথা পায় মনে।

সঞ্চয় করেছি রস শিরায় আমিও,
উপরে মরণলোকে জ্বলে লক্ষ তারা,
এ সংযোগ শতাব্দীতে নয় প্রাপণীয়,
কথা শোন্, কথা রাখ, ঘুমায় পোকারা।

রবীন সুর

নিজেকে কতটা রক্তমাখা রাখা যায়

জুলফি ও কানের লতির মাঝামাঝি অদৃশ্য হাতের
নিঃশব্দ পিস্তলের
নলের অদ্ভুত শাসনে আমি দুহাত তুলে
সারাদিন রাজপথে ক্রীতদাস পায়ে পায়ে বারুদ গন্ধের বাতাসে
যাবতীয় উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি রঙের প্রতি
মনোযোগ দেবার উদ্যোগ
কেমন অজ্ঞাতসারে শ্রুতি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি

হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক স্পন্দনের পরিবর্তে এখন
সেকেণ্ডে বাহাত্তর বার বিস্ফোরণে পেটোয় বোমায়
যে-কোনো পাঁজর আর বুকের খাঁচায় যথাযথ থাকে না

ধারালো চাকুর চমকে
শিরদাঁড়াঠেকানো তলপেটে ক্ষুধা নেই

হন্তারক জিঘাংসায় যারা পাশাপাশি
তারা কেউ সঙ্গত শত্রু নয়
তবু প্রতিদিন ঘুমে জাগরণে
নিজেকে কতটা রক্তমাখা রাখা যায়
আশ্চর্য প্রতিযোগিতায় রেফারিবিহীন ফলাফলের হিসাব জানি না !

ফ্রিজশট

আসলে একজন অলৌকিক চিত্রপরিচালক চিত্রনাট্যের শর্তে বশীভূত
সমগ্র দৃশ্যটিকে কুশীলব সমেত ফ্রিজশটে বেঁধে রেখেছেন
না-হলে এমনতর ইতিহাস আবর্তিত কলিঙ্গের রক্তমাখা
নিষ্ঠুরতায় ভগবান বুদ্ধের করুণাপ্রধান মূর্তি
কিভাবে ঝুল আর মাকড়সার জালের কুলুঙ্গিতে স্থির হয়ে বসে আছে
কেন অশোকের মতন বিশাল বাহুর অসংখ্য উৎসাহের ফলশ্রুতি
হাজার হাজার সঙ্ঘমিত্রার দূরান্বয়ী ইচ্ছায় ছড়িয়ে পড়ে না

দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে
ঘন সুঁদরি বনের আড়ালে ভয়ংকর বাঘের চোয়াল স্থির
কদাচিৎ সিলিং পাখার দাক্ষিণ্যে নড়ে
ধারালো দাঁতের ওপর দিব্যি এক টিকটিকি
আরশোলার ঘাড় কামড়ে লাট খাচ্ছে

আলো ছল্‌কে ওঠে কৃষ্ণনগরের ভেনাসের নাভির পালিশে
বস্তুত অক্ষতযোনি রমণীর বৈবাহিক আকাঙ্ক্ষার পাশে
সব ঘটনাই অনিবার্য পরিণতির সম্ভাব্যতার দিকে
শুধু কিছুক্ষণের জন্য সব স্থির হয়ে আছে

সামসুল হক

বীজাণু

পর্দার আড়াল থেকে কার কণ্ঠ ডেকে উঠলো 'রানু,
গভীর আদ্রর্তা থেকে কার কণ্ঠ ডেকে উঠলো 'মণি',
পর্দার আড়াল থেকে ছড়ালো কে অসংখ্য বীজাণু
কে যেন আমাকে ডাকছে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে এখনি

'মৌলকণ্ঠ' পরিহাস ঘরময় বিশ্রী মাতামাতি,
পোকার দাপটে জীর্ণ হয়ে গেছে বৃক্ষ লতাপাতা :
কয়েকটি মানুষ পথে স'রে যাচ্ছে, গলায় প্রভাতী ;
পাহাড়ের শীর্ষে উঠে কার কণ্ঠ গায় শোকগাথা।

এইখানে শেষ হলে ভালো হতো। কয়েকটি নারীর
অপ্রসন্ন শিশু কেন ভুলে যায় দীর্ঘ 'মা-মা' ডাক,
কয়েকটি পুরুষ কেন তুলে দেয় হঠাৎ প্রাচীর
বুকের উপর দিয়ে কেন রাত্রে ডেকে ওঠে কাক।
বীজাণু আশ্চর্যভাবে রয়ে গেছে মাথার ভিতর :
বীজাণু দিয়েছে ঢেকে পুরুষ ও রমণীর ঘর।

মৃত্যুর প্রতিভা

মৃত্যুর এক-ধরনের প্রতিভা আছে,
যে-কোনো পূর্ণিমা যে-কোনো অমাবস্যা একসঙ্গে দেখাতে পারে
এবং একইসঙ্গে সূর্যালোক ও চন্দ্রালোক,
প্রবেশ ও প্রস্থান,
সন্ন্যাস ও বিপ্লব।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমি যখন রাজা ছিলুম

বালককালে, আমি যখন রাজা ছিলুম বালককালে
সকাল বিকাল বসতুম এসে গাছের ছায়ার সিংহাসনে
হাজার গ্রাম তুলে দিতুম ভূমিবিহীন প্রজার হাতে
ভিখিরী-মার ঝুলির ভেতর রাজভাণ্ডার ঢেলে দিতুম
আমি যখন রাজা ছিলুম, রাজা ছিলুম বালককালে
অত্যাচারীর মুণ্ডু নিতুম কোমর থেকে অসি খুলে
দৈত্যদানো ধরে ধরে চাপিয়ে দিতুম শূলের মাথায়
বালককালে, আমি যখন রাজা ছিলুম বালককালে।

এখন আমি রাজ্যবিহীন হাড়হাভাতে বাউণ্ডুলে
পথে ঘাটে ফ্যা ফ্যা করে একলা একলা ঘুরে বেড়াই
হামলা দেখলে ছুটে পালাই দুচোখ বুজে ঊর্ধ্বশ্বাসে
এবং দুঃখ ক্রোধ ও ভালোবাসার টুঁটি চেপে
নারীহরণ খুঁটে তুলি জিভে চেটে কাগজ থেকে
এখন আমি রাজ্যবিহীন হাড়হাভাতে বাউণ্ডুলে
রেসের মাঠে মাতাল হয়ে মানত করি জোড়াপাঁঠা
সুযোগ পেলেই চুরি করি কুঁড়েঘরের শীতের কাঁথা।

প্রসন্নতা সমীপেষু

কোথা থেকে এলে তুমি ? দিক ভুলে নাকি ?
প্রসন্নতা ! রক্তে বুঝি পুনরায় প্রবল বোকামি
এলে যদি, জনসাধারণ হয়ে সাবধানে চলাফেরা কর
ওরকম মরালগামিনী হলে পুলিশের চোখে পড়ে যাবে
প্রসন্নতা ! পাতাবাহারের মতো বড় বেশি সপ্রতিভ তুমি
ওরকম অশালীন হাসি— চেঁচিয়ে ফাটিয়ে কথা বলা
না—না—এ সকল ভীষণ বুনোমি কিছুতেই সহ্য হবে না
সকল প্রকার বিশেষণবিহীন থাকা এইখানে বাধ্যতামূলক !

কথা শোনো প্রসন্নতা— অতি বাড় ভাল নয়
কথা শোনো প্রসন্নতা— কথা শোনো
বাহুড়বাগানে এসে দিনের প্রতিভা লাট খেয়ে পড়ে
বকুলফুলের হাসি বকুলতলায় ঝরে যায় ।

শংকর দে

কালি দিয়ে লেখা শাদা পাতা, ৪৯

কবিতা কি ? পোশাকের মতো
ঢেকে রাখে কবিতার দেহ ;
কবিতা কি ? মনের অসুখ
দেহ ছাড়া মন ভালো নেই ;
কবিতা কি ? কপালের টিপ
রোদ্দুরের ছায়া পড়ে জলে ;
কবিতা কি ? ভেঙে পড়ে চাঁদে
কবিতা কি ? জলে ভিজে কাঁদে
কবিতা কি ? কবিতার ছায়া
কবিতা কি ? শাদা হয়ে যাবে ;

কবিতা কি ? মানুষের চোখে
কবিতা কি ? ধরা পড়ে যাবে ;
কবিতা কি ? জল হয়ে যাবে
জলে হাত দিয়ে বোঝা যাবে ;
কবিতা কি ? কবিতার শব
কবিতা কি ? ছাই হয়ে যাবে ;
কবিতা কি ? মাটি দিয়ে লেখা
কবিতা কি ? মাটি ভেঙে দেখা

স্বপ্নলোক

সাক্ষী, সেই সব দিনের কথা
আমি ভুলে গিয়েছিলাম, অচেনা অক্ষরে
আমি লিখে রেখেছিলাম, ঘরে ফিরে
আমি কী দেখেছিলাম, শাদা পাতা ?
রোদে পুড়ে জলে ভিজে একা
গাছের মাথায় ফাঁকা মেঘ উড়িয়ে
আমি কী কখনো চেয়েছিলাম ছাই
আগুনের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নলেখা ?
আমার চোখের সামনে আয়নাপরী
আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম
পাথরের দেবতা হাতে নিয়ে
আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম পথের কাঁটায়
গাছ পেরিয়ে নদী পেরিয়ে আকাশ পেরিয়ে
যে কথার বৃষ্টি পড়ে জলে
ভেসে যাওয়ার মতো
রোদ্দুর, এই চৌকাঠ পর্যন্তই আমি জেনেছিলাম

দেবী রায়

আমায় ধরে কোন শালা—আ

বোবা-কালার ভূমিকার অভিনয় করছি, আমি
আমরা
সবাই এখন, বোবা কি কথা ব'লতে পারে
না, কানে শুনতে পায়— কালা ?
সকালে, কড়ারোদ ঘুম ভাঙাচ্ছে আর হাত,
ঘাড়ে রেখে—
পরখ—
করছি সবাই, মুণ্ডু স্বস্থানে আছে কী না !
চায়ের পেয়ালা টেনে নিচ্ছে—
সন্ত্রস্ত-আঙুল,
ঠোঁট আর জিব পরখ করছে, উষ্ণতা—
স্বাভাবিক কী না।
চোখ ছুঁয়ে যাচ্ছে— দ্রুত, বেশ্যাসংবাদপত্রের
হেডিং
সুগন্ধি সাবান মেখে স্নান সারছে চকচকে—
শরীর
ও যথাসম্ভব ঢেকেঢুকে, ভদ্দরলোক সাজাচ্ছে
টেরিলিন-টেরিকট আর রিড্যাকৃশন সেলের—
জুতো
অবসরে, শিং ভেঙে বাছুরের দলে ক্রমাগত ভিড়ে যাচ্ছি
যেনো কেউ চোরাগোপ্তা, ঘাড় মটকে না দেয় !
এবং ট্রেনে-বাসে, মুখটি বুজে থাকছি
হুঁ-উ-উ বাবা-আ, 'আমার চেনে কে'
অফিসে, ঘাড়-গুঁজে কাজ সারছি
বড়োবাবু-কে, সুবিধেমাফিক তেল মারছি
গা বাঁচিয়ে, নিয়মিত মিটিংয়ে যাচ্ছি

আবার, আলোয় আলোয় পাকা গেরস্তর মতো—
ঘরের ছেলে ঘরে, ফিরে আসছি
এবং সুযোগ বুজে বোবা কালা সেজে যাচ্ছি
'আমার ধরে কোন শালা-আ' !

একজন রমণীর মুখ

এক একজন রমণীর মুখ— যেনো ভালোবাসা
এক একজন রমণীর বাহুমূল— যেনো—
বড়োজোর, ভালোবাসার ভঙ্গিমা
যা কখনো-ই ভালোবাসার নয়
এক একজন রমণীর বুক— নীবিবন্ধ দেখে
মনে পড়ে যায়— আদিমতম প্রস্তর যুগের গুহা
ঝটিতেই, পাঁজর খসিয়ে আমায় নিয়ে যেতে চায়
—কোন নরকে ?
ট্র্যাফিকবাতির রক্তিম নিষেধ, নিমেষে খাড়া করে
হতচকিত—ফুটপাতে !
আমার হুঁশ ফিরে আসে, পুনরায়—
ভীরুপায়ে, হেঁটে ফিরে আসি আবার !
এক একজন রমণীর নিবিড়-ঘন কালো চোখ—
যেনো শালগুল্ম ঘেরা, হাতছানি দেওয়া
সবুজ বেনামী বন্দর !
অথচ এ-ও ঠিক
মাত্র একজন রমণীর মুখই বিপর্যয় ও নিয়তি আমার।

পরেশ মণ্ডল

শরীর ভূখণ্ড

পথ ছেড়ে দাও
নইলে মাড়িয়ে যাবো
শরীর ভূখণ্ড
রাতদিন একই অনুতাপ সয় না
আমি সমস্ত রাজ্যপাট খাদের নিম্নভূমিতে নুইয়ে দেবো
তখন দোষ দিও না
করুণার জন্যে
পায়ের কাছে ফুল রেখো না
এতোদিনে বুঝেছি
কারুর মুখ নেই
স্বভাবত চোখ
অন্ধ
কেবল জিভ
পথ ছেড়ে দাও
নইলে মাড়িয়ে যাবো
শরীর ভূখণ্ড

বিকেল

যে যার বাড়ি গেলে
ফাঁকা ঘর
জানলা বন্ধ
খালি চেয়ার
বাতাস ফিরে গেল
আলো বেঁকে গেল
শব্দ থমকে গেল
পাখা ঘুরছে না
শরীর টলছে
মনের মধ্যে মন
লোকটার হাসি
দিনের পর দিন
তাহলে বিকেল
তাহলে নাম
এবং ছবিটা
এবং বিকেল

রথীন্দ্র মজুমদার

কেউ শুনুক কেউ দেখুক

কেউ শুনুক বা না শুনুক হাওয়া উঠেছিল
আমি ঠিক ঘাসের ওপরে ছাপ দেখতে পেয়েছি
এই গ্রীষ্মে শরীর স্রোতের দুধার
জল ছুঁয়ে পথিক হেঁটে যায়
প্রত্যেক ধুলোর মুখ আরেক ধুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে
আমি ফিরে তাকাই কে মাটির বুকে হাত রেখেছিল
মানুষের চোখে চোখ রাখার কষ্ট
অনেক দূরের হাওয়া, শব্দ
আজও সঠিক বুঝে নিতে হয়
কেউ দেখুক বা না দেখুক এই তো বুকের ওপর দেয়াল
সেখানে দাঁড়ালে মানুষ-প্রমাণ জগৎ শরীর
একজন অপর অন্যজন
মুখোমুখি শক্ত-বন্ধন তবু উত্থিত হাত
কাঁপে কি কাঁপে না দেখতে হয়
ওই দূরের দিকে মাটি জলে-কাদায় শিশু
এই তো নারী তার আঁচল লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়
উঠোন-ওপার রোদ্দুর, রক্তিম
সারা আকাশ ছড়িয়ে ভাঙে কখন
তার গায়ে হাত রেখে একদিন
অবসান ধ্বনি শুনতে হয়

তোমার নিঃশব্দ তরবারি

রাস্তা জুড়ে মানুষ কিছুই দেখা যায় না
এপার থেকে ওপার হয়ে ওঠে না
আজও ব্রীজের পারাপার !

কবে থেকে বয়ে এনেছি দুকাঁধ
বালি-ইট-সুর্কী-সিমেণ্ট
শঙ্খচুন রঙবেরঙ স্তূপ স্তূপ
হাতের কণিক সময় গড়িয়ে যায় !

ওপারে পার্কের মঞ্চ থেকে
তবে কি উড়িয়ে দেব নিশান—
কিছুই বোঝা যায় না
শব্দের ভেতর থেকে শব্দ
যেন পাথর ফুঁড়ে স্রোত
ভিড়ের মানুষ কথা বলতে চায় !

এপারে আলোয়
ক্যান্সার হাসপাতালের প্রস্তর ফলক—
কর্কটের ওপর তোমার নিঃশব্দ তরবারি !

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

আমার প্রভুর জন্য

আমাকে আমার প্রভুর জন্য পবিত্র থাকতে দাও
সূর্যসংবেদনে বজ্রে
আমাকে উৎকীর্ণ কোরো না।

হে জ্ঞানী পিতৃকুল,
তোমাদের আভূমি প্রণাম
কন্যাকে ত্যাগ করো অন্ধকারে।
তোমাদের ঘৃণাঞ্জন আমার অঙ্গলেপ, বিস্মৃতি তমস্বান উত্তরীয়
ধিক্কারে রাত্রিস্তোম সংকলিত হোক।

সেখানে
আমার প্রভুর জন্য আমাকে পবিত্র থাকতে দাও

নীলবড়ি

'নারী বা প্রকৃতি বলো, কিছুই কিছু না।
তার চেয়ে এক সন্ধ্যা দু-একটি মনের মতো বন্ধু পেলে
প্রাণ খুলে আড্ডা দেওয়া গেলে
সমস্ত অসুখ সেরে যায়
মন ভাল থাকে,
বিদ্যুৎগতিতে লেখা হয়
পর পর সাতটা কবিতা—'

এপ্রিল সন্ধ্যার ঘোরে একজন বললেন
এবং কথার ভাণ্ড খালি হলে তিনি দিব্য প্রস্থান করলেন।
আমি চুপ করে হাঁটি
মাথায় ঘুরপাক খায় সরল কথাটি—
সমস্ত অসুখ সেরে যায়
সমস্ত অসুখ, শুধু সুখ!
মাথায় ক্রমশঃ জটা ধরে
শান্তি নষ্ট হয়—

বন্ধুর সান্নিধ্য পেলে সমস্ত অসুখ সেরে যায়···
বন্ধু তবু এখনও নিঃঝুম!
'মিথ্যে কথা, বন্ধু কেউ নেই'—
একবার চেঁচিয়ে উঠি, এবং তারপর
নীলবড়ি, ঠাণ্ডা জল, বাধ্যতামূলক মাপা ঘুম।

মানিক চক্রবর্তী

নায়ারের ফ্ল্যাট

অনেক জিনিসে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ—
নায়ারের ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে চলে যাই সম্পূর্ণ নীরবে ;
শোনো— আমার জন্যে তুমি শুধু যাবে,
তোমাকে যেতে হবে
আমি-ই তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবো
নায়ারের সিঁড়ি দিয়ে অন্তঃপুর !

নায়ারের ফ্ল্যাটে আমাদের ছবি আছে,
আমাদের শোবার খাট,
বেশ বড় ক্যালেণ্ডার ;
নায়ারের ফ্ল্যাটে তোমার পুরনো আঙুল
বারবার আঁকড়ে ধরা যায়,
নায়ারের ফ্ল্যাট আমাদের দাবী ।

তখনই উস্কোখুস্কো চুল, পরস্পর গালিগালাজ—
ঠেকালাম পিঠে পিঠ দুজনেই বেঁকে গিয়ে—
নায়ারের ফ্ল্যাট, নায়ারের ফ্ল্যাট,
ওরকম রাত কতো চলে যায় ;
সমাপ্ত হয়েছে কাজ মনে করে,
কতো, থেমে যায় !

নায়ারের ফ্ল্যাটে বাচ্চারা জন্মাতে পারে না ।

মুকুট

তোমার দৃশ্য সব মনে আছে,
মাত্র এক যুগ পেরোল ;
এই এক যুগে তুমি কি শ্লথ
না আরো সুঠাম
আমার জানার কিছু আছে ?
সব দৃশ্য মনে আছে।

সব শাস্তি মনে আছে।
এই এক যুগ আমাদের কান্নাকাটি
আমাদের হাহাকারে যদি ভরে গিয়ে থাকে,
আমরা কি বলেছি, খারাপ লাগছে ?
পাহাড়ে গিয়েছিলাম,
তবে আর ফিরতাম না ;
সমুদ্রে গিয়েছিলাম— সমুদ্র কোথায় নিয়ে যেতো !

আমরা তো ফিরে এসেছি।
চিন্তা করো কোথায় গিয়েছিলাম ;
তোমার ভয়-ভীতি, মৃদু হাসি,
বিকেলে তোমার চুল-বাঁধা,
সব নিয়ে ফিরে এসে আমরা
কিছু কি হারিয়েছি,

একমাত্র মুকুট ছাড়া ?

অরুণেশ ঘোষ

ভ্রমণ/

উঁচু আর ধবধবে বারান্দায় পাতা হল হোগলার চাটাই
আমাকে বসতে দিল ওরা— হাত আর মুখ ধোওয়ার জন্য
ঝর্ণা থেকে স্বচ্ছ জল আর অরণ্যের উথলে ওঠা হাওয়া···নিয়ে এসো
আনো, বড় নোংরা এই শরীর— বড় নোংরা ধুলোয় ঘামে
আমার চোখে দাও তোমাদের জল-হাওয়ার ছাট
পবিত্র, বিষিয়ে-না-ওঠা জল হাওয়ায় ছাট— খসে পড়ুক
আমার চোখের ছানি— স্তন থেকে হাঁটু অব্দি শাড়ি পরা
রাভা মেয়েদের দুই হাত দুই নগ্ন কাঁধ থেকে বেরিয়ে এসে
আমার কাঁপা হাতে তুলে দেয় হাঁড়িয়ার টলমলে গেলাস
কচিপেয়ারা পাতায় গন্ধেভরা এই তরল বিদ্যুৎ
ওরা হেসে ওঠে-এ-ই, এই বুঝি গড়িয়ে পড়বে জলের মতন
অরণ্যে— বোশেখ মাসের অরণ্যে অঝোরে বিষ্টি হয়ে যাওয়ার পর
রোদ আর বাতাস— ওরা হাসতে থাকে— ওদের হাসি আমাকে—
বিষণ্ণ করে আমাকে এড়িয়ে যায় হাওয়া, আমি বসে থাকি চুপচাপ

ভ্রমণ/

সবচে' নোংরা আমার জিভ— সবচে' নোংরা আর মসৃণ
ওগো রাভা পল্লীর গাঁওবুড়ি— দ্যাখো তোমার সামনে এসে
কেমন জড়সড়ো আমার জিভ— কেমন ভীতু আর লাজুক
শুধুই আমার চোখ— যে চোখকে নষ্ট করতে পারেনি আমার জিভ
যে চোখের জন্য আমাকে আমার মাও ক্ষমা করতে পারেনি কোনদিন
আমি 'দলবাবু' কিনা জিগ্যেস করার পরই, আমার চোখের দিকে
তাকিয়ে হেসে উঠেছো তুমি— দাও, আরও নিয়ে এসো

কচিপেয়ারা পাতার গন্ধেভরা তরল বিদ্যুৎ— ভাঙো আমাকে
ভাঙো আমার জিভের জড়তা— এই জিভ ঘুরে এসেছে অনেক শব্দ
অনেক গিজ্‌গিজে শব্দের শহর অবহেলায়, ব্যবহারে ব্যবহারে
ব্যবহৃত হতে হতে সে ভুলে গেছে কেনইবা তার এই অনবরত নড়ে ওঠা
ওগো রাভা পল্লীর গাঁওবুড়ি— আমাকে এনে দাও ফালি-করে-কাটা—
বন্য গুবাক, বাঁশ পাতার মতন লম্বাটে-খসখসে হাব্‌লি পান
আমাকে শেখাও ভুলে যাওয়া গান···তোমাদের জিভের ব্যবহার···

বেলাল চৌধুরী

শ্রীমন্ত বিদূষক

গোলকধাঁধার মতো পথগুলি সব জড়িয়ে ধরছে পাকেপাকে
লুটিয়ে পড়ছি আমি গড়াগড়ি দিচ্ছি ধুলোয় মাটিতে একাকার
ঘুরছি ফিরছি শুধু দিশাহারা পাচ্ছি না খুঁজে কূলকিনারা
কাটছে আমার এমনি করেই সন্ধে সকাল সারাবেলা
দাঁড়িয়ে সবাই লুটছে মজা দেখছে বিনিপয়সার তামাশা
দেখছে হাসছে অবাক কেউ কেউ আদ্যোপান্ত যেন হাঁসের দলে ফেউ

ছাখোনা এক্ষুনি আমি খুলে ফেলছি সব সাজপোশাক
ছুটবো ষাঁড়ের মতো একরোখা তখন দেখবে কত ধানে কত চাল
রঙিন পালক গোঁজা গাধার টুপি উড়বে ঘুরবে শূন্যে
লাফিয়ে উঠবো দশহাত শূন্যের ওপর কুম্ভীপাক
দুদিকে উঁচিয়ে পা তলপেটে মারব টেনে প্রচণ্ড লাথি
দেখতে চেয়েছো দেখাবো তখন— আগে ছোঁও তো বুড়ি

নিজের বিষয়ে দু'চার কথা

এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো
আমার কলম ঘুরে বেড়ায় মানস-সরোবর
আমার রুমাল ওড়ে চিল্কা থেকে সুদূর বোরোবুদুর
আমার সময় কাটে কাক ও কাকাতুয়ার ঝাঁকে
এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো
আমার চিঠি ঔরংগাবাদের এক্কায় চড়ে ইলোরায়
আমার চটি স্বপ্ন দেখে নীহারিকার
আমার চোখ চোখ মারে ইচ্ছে মতন
এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো
আমার জামা এক নিমেষে ভ্রমণ করে দুই গোলার্ধ
আমার জুতো লুটিয়ে পড়ে ঘুমঘোরে
আমার মোজা অভিমানী বন্ধুবিহীন
এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো
আমার ঘড়ি তড়িঘড়ি ঘুমিয়ে পড়ে
আমার হাত সোনার পাত
আমার আঙুল রূপোর চামচ
এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো
আমার গান তারার আলোয় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলি
আমার প্রেম ছন্নছাড়া বৃন্দাবন
আমার বধির এবং শব্দহীন
এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

আমি কুড়িয়ে পেলুম গুপ্ত যুগের তাম্রশাসন
আমি ছুঁড়ে মারি যেমন খুশি কলসি কানা
আমি নামিয়ে নিলুম টুপির কানাত
এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো
বেল পাকলে কাকের কি
কাকের বাসায় কোকিল পাড়ে ডিম
আমার গল্প ফুরোয় নটে গাছটি মুড়োয়
এই ভাবেই তো
এই ভাবেই তো

শান্তনু দাস

কবিতার খাতা খুললে

কবিতার খাতা খুললে সটান কোঁচড়ে পড়ছে
শ্রীহরি লণ্ড্রীর বিল গয়লার হিসেব ফর্দ
তেল নুন সব্জি কেরোসিন।

পাজামা কামিজ সামনে যখন যা পাচ্ছি
পরেই বাজার যাচ্ছি, পয়সা গুনছি হিসেব মতোন,
এভাবেই গুনতে গুনতে শুনতে শুনতে মাছির আওয়াজ
ময়রার ফ্রিজের মতো গুরগুর করতে করতে
একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবো।

জমে যাচ্ছি একদম,
এখন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি—হ্যাঁ মশায়
মনে পড়ে, বলুন তো নাম ?

আপনি না কোনোদিন জুঁই ফুল বুকে নিয়ে বর্ষার ঝাঁপিতে
ঘাসে মুখ ডুবিয়ে ছিলেন ?
মনে পড়ে ?

কিছুই পড়ে না : রিমঝিম
এখন বর্ষায় খুঁজি ইলিশের ডিম,
বসন্তে বোর্ড দেখি ভীষণ ছোঁয়াচ টিকে নিন
হেমন্তে জমলে দুধ ধানের বোঁটায়
চালের টিনের কথা মনে পড়ে যায়।
এভাবেই বেঁচে বর্তে যদ্দিন টিকে আছি জানি—
কবিতার খাতা খুললে সটান কোঁচড়ে পড়বে
গয়লার হিসেব ফর্দ
শ্রীহরি লণ্ড্রীর বিল তেল নুন সব্জি কেরোসিন।

মুচি

আমার সাতহাত দেহের পায়ের তলায় এখন সূর্য—
মাথা গেড়ে বসে থাকে।
সকাল— রোদের বল্লম চালিয়ে দেয় আমার বুকে,
আমি সরে দাঁড়াই।
আমাব পায়ের চপ্পলে সাঁটা মাছি,
স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যায়।
আমি পা বাড়িয়ে দিই সেই বুড়ো মুচির কাছে
ছটা ঋতু শ্যাওলা হয়ে জমে আছে যার পিঠে,
আর
চামড়ায় ঝুলে আছে বাদুড়ের অন্ধকার,
কোঁচকানো ডানায়-ঘাম, কাস্ত-সময়।

তার চোখের সামনে দুটো কাঁচে ঝাপসা শহর।
সে আমাকে চেনে না, চটি জানে।
সে কি দেখতে পায় কলকাতার বুড়ো-হাড়ে
নিতম্ব কাঁপিয়ে উঠছে স্কাইস্ক্র্যাপার?
মাগীর দালাল? কালোয়ার? কিংবা ভালবাসার নৌকো
নোঙর ফেলতে ফেলতে কলকাতার গঙ্গায় পানকৌড়ির-ডুব?
মাছের কাঁটার মতো দূরের ছাতের অ্যান্টেনা?
পেলে? উইন্টার বল?
সে কি টি ভিতে দেখছে আমজাদ? কাগজে—কার্টার?
ছ'মাসে ইন্দিরার কুঁচকে যাওয়া চোখের চামড়ায়
নীলস্বপ্ন,
স্বপ্নের সিঁড়ি?

কাঁটা পেরেকের মুণ্ডু নিপুণ মেজাজে ঢুকে গেলে—
খুশি হয় বুরবক পাগল,
ছেঁড়া গেঞ্জি বিবর্ণ পতাকা হয়ে ওড়ে,
তার ছুঁচ—পাতাল রেলের মতো ফুঁড়ে ফুঁড়ে
ক্রমশঃ এগোয়।
ক্রমশঃ এগোয়—
ছিটকে যাওয়া ছেঁড়া-স্ট্র্যাপের শহর কলকাতা।

সে ক্রমশঃ কুঁজো হয়। হতেহতে হতেহতে
ভিড়ের খেলায় থাকে কচ্ছপের মতো।

প্রতিমা রায়

বুড়ি বসন্ত

ঠিক যেন বুড়ি বসন্ত খেলছে চাঁদটা আর মেঘ।
তোমায় আমি যেমন ছুঁয়ে যাই মাঝে মাঝে।

আজ রূপের হাট বসিয়েছে।
ঠিক যেন শরৎচন্দ্রের পিয়ারীবাই।

সকাল বেলা ঘুমিয়ে ছিলে কি ?
না আমিই তোমার চোখটা চেপে ধরেছিলাম ?

গলির মোড়ে সোডার বোতল আর একদল ছেলের নোংরা টিটকারী,
হোলির রঙ চুবিয়ে রাস্তা দিয়ে মিথ্যে মড়া নিয়ে যাওয়া
এসবের থেকে আড়াল করব বলে।

এরপর—
রং খেলে যেন তোমার সাবান দিয়ে
ঘষা মাথার ফেনার মতো সন্ধ্যে এলো,
এখন তোমায় দেখবে নিয়ন লাইটরা,
রূপসী কলকাতার বেলোয়ারী চুমকি।
আর অনেক রাতে—
আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে দেখবো শুধু দূর থেকে
দু চোখ ভরে।

দেখবো তো ?

সত্য

তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার বুকের
গরম মাটি ছাড়া বাঁচবো না,
তাই ভেবে আমাকে শেকড় শুদ্ধ তুলে এনেছিলে
দশ নখ দিয়ে।

এখন কি দেখলে ?
তোমার দুই বুট পরা পায়ের বলিষ্ঠ আওয়াজে
ফের একটা ঘাসের চারা থরথর কাঁপছে
ইঁট চুন সুরকীর মধ্যে !

আসলে কাঁপছে কি হাসছে কে জানে ?

সুব্রত চক্রবর্তী

কবির ঘর-গেরস্থালি

ঐ ছাখো কবির বাড়ি—কবি তো সন্ন্যাসী নয়,
ওর ঘর-গেরস্থালি আছে।
আছে ন্যুব্জ বাবা তার ; বারান্দার সামান্য রোদ্দুরে
ঐ ছাখো উনি বসে,
চোখে ঘুম,
হাত-থেকে-খসে-পড়া গুড়গুড়ির নলে
লাল-পিঁপড়ে ঘুরে যায় ; বারান্দায় ঐ তো রোদ্দুরে
শালিক-পাখিরা আসে,
তাই দেখে তালি দেয়, হাসে
কবির প্রথম মেয়ে,
কাল রাত্রে পরী দেখেছিলো।

কবি-পত্নী রোগা, তবে ঘন-চোখে, সারা মুখে সরের মতন
মমতা ছড়িয়ে আছে ;
কবি তা'কে ভালোবাসে খুব—
কবি তা'কে এনে দেয় বেল-ফুল, এনে দেয় চুড়ি
সাঁওতালী মেলা থেকে ;
তা'কে নিয়ে বাড়ির উঠানে
বেল-চারা পুঁতে দেয়। স্ত্রীর ইচ্ছে, আগামী বর্ষায়
ফুলে ফুলে ছেয়ে যাক বাড়ি।

কবি তো সন্ন্যাসী নয়, ঘর-গেরস্থালি করে,
টাটকা মাছ কেনে প্রতিদিন—
আর লক্ষ পচা-শব্দ, ক্ষুদে লাল-পিঁপড়ের মতন
কবির মগজ খুঁড়ে চলে যায় অন্ধকারে,
বেলা-অবেলায়।

নিঃস্বপ্ন, একাকী

রাতের গোপন পথে সঙ্গিহারা, নিঃস্বপ্ন শিশুর
অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যায়। ও শিশু কাদের !
একা-একা, মধ্যরাতে, স্তব্ধ, মৃত বীজ নিয়ে আলো ও তিমিরে
দু'টি শান্ত হাত তা'র প্রসারিত হয়ে থাকে ; ঠাণ্ডা করতলে
শক্ত, কালো রক্ত ছুঁয়ে আছে তা'র নষ্ট স্মৃতি,
ছুঁয়ে আছে সমাধিফলক।

রাতের মায়াবী পথে ঝরে জল, মরা পাতা,
খড়কুটো, পাখির পালক…
একাকী বালক হাঁটে সারারাত পথে-পথে ! কী এক ইশারা
গাছের বিষাদে ওকে কেন ডাকে ! গভীর মর্মরধ্বনি ওকে বলে :

'ফাটে বীজ, বীজের নিয়মে—
যাও তুমি গুপ্তদেশে, ঐ দেশে কর্পূরে ও মোমে
স্বপ্ন পাবে, সহচর পাবে।'

মধ্যরাতে, পরিণতিহীন, টানা শিশুর পায়ের শব্দ
শোনা যায় ;
ও শিশু কাদের !
দুটি ঠাণ্ডা হাত তা'র ডানার মতন কাঁপে ;
মৃত শালিকের
গলার খয়েরি লোম ওকে ডেকে নিয়ে যায় গুপ্তদেশে,
পাথরের উৎকীর্ণ-লিপিতে।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

এখানে আমি

এখানে আমি

আমার শরীরের অসংখ্য ক্ষতমুখ থেকে
রক্ত ঝরে পড়ছে
রক্ত
ঝরে পড়ছে
এবং ক্ষতমুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়লে
সমস্ত শরীরে কালো দাগগুলো
আরো গভীর হয়ে ওঠে

চারদিকের দৃষ্টিহীন অন্ধতা আর
বধিরকরা প্রচণ্ড কলরবের মধ্যে

এই আমি
আমি আর কিছুই স্পষ্ট করে বলতে পারি না
আমার জিব অনড়
আমি আর কিছুই করতে পারি না
আমার শরীর অসাড়

আমি এই নতজানু ছায়ায়
এবং ক্ষতমুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে
এখানে কে এসে তার নিবিড় স্পর্শে
আমায় জাগিয়ে দেবে
আমার শরীরের কালো দাগগুলো মুছে দেবে
কে কে কে এসে আমায় বলে দেবে
কোন দিকে পথ
আর কোথায় রয়েছে জল
এইত আমি
এখানে এই নতজানু অন্ধকারে

আগুন

আগুন।
পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে
ধীরে ধীরে
গোড়ালি পাতা পা হাঁটু উরু কোমর শিরদাঁড়া
হাত হাতের তালু আঙুল নখ
বুক গলা
জিব তালু নাক চোখ কপাল বেয়ে
মাথার ভেতর উঠে আসছে
জ্বলছে
চোখ চোখের সামনে যাকিছু
আগুন
লাল নীল গোলাপী হলুদ শিখা
জ্বলছে
সমস্ত শরীর
জ্বলছে
চোখ
চোখের সামনে যাকিছু

রমা ঘোষ

পাতা ঝরে গেলে

বাঁশ ঝাড়ে পাতা ঝরে গেলে
চৈত্র পূর্ণিমায় দেখা হয়ে ছিল তার মুখ
তপস্বিনী বিধবা সে
নরম জ্যোৎস্না ভেজা দুঃখী উরু নীল স্তন গভীর চিবুক

বুকের উপর বরাবর এক শীর্ণ নদী শান্ত শুদ্ধ স্রোত
বেদনার দাগ টেনে উড়ে গেছে খেয়ালী কপোত।

যদি

যদি কোনোদিন না ছুঁতে চোখের পাতা
চোখ কী জানতো কতো দেখবার আছে !
টলতো না নদী বলতো না পাখি কথা
পরুষ পাহাড়ে ফুটতো না বনভূমি।

যদি কোনোদিন না নিতে তুচ্ছ খুদ
জানতো কী এই কার্পণ্যের মুঠি
দিতে পারা কতো ফিরিয়ে যে দেয় দান
মুক্ত করেছি অঘ্রাণে গোলাবাড়ি।

যদি কোনোদিন ডাকতে না কালো রাতে
বসাতে না দাঁত ক্ষতের চিহ্ন আঁকা
কান্না আমার বাকি থেকে যেতো ঠিক
ব্যথার কী সুখ বলে দিতো কোন সুখী !

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

শব্দ

একটি দারুণ শব্দ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো বিস্ফোরণ
দূরতম অন্তরীক্ষ চকিতে দেখাবে
গোপন থাকবে না কিছু—নির্বাস প্রান্তর হবে তোমার হৃদয়

একটি বিখ্যাত শব্দ প্রেমিকার সমস্ত কথাকে
স্তব্ধ করে দেবে—
ক্রমে তার মুখ হবে গোধূলির আশ্চর্য আকাশ
রক্তকরবীর ডালে আরো বেশী রক্তের জোয়ার।

সমাদৃত সেই শব্দ স্মৃতি হবে কিছুকাল পরে।

পা

আমার নাভিতে তোর পা।
রাক্ষুসী পা তোল।
এমন নরম পায়ে এত ভার তোর
আরাবল্লী পাহাড়ের সম্পূর্ণ এখন
আমার নাভিতে জেগে ওঠে।
আমি বাসুকির মত উগরে দেব বিষ—
নীলকণ্ঠ কে রয়েছে বল্!
যে নেবে আমার এই দুঃখের উদ্গার
অম্লান হৃদয়ে—
আমার নাভিতে তোর পা—
রাক্ষুসী পা তোল।

তবু তুই মাঝে মাঝে পা দিস বলেই
মনে হয় আমি বেঁচে আছি
অলকাবলকাগুলি অর্থময় ধ্বনি।
তুই কি ময়ূরী ?
অজস্র ময়ূর সঙ্গে নিয়ে
যোশীমঠে আকাশের নীলতাঁবু বেঁধে চলে যাস-
সার্কাসের খেলা হবে— আমি খেলোয়াড় ?
না কি বিদূষক ?
যথার্থ খেলার মাঝে সামান্য বিশ্রাম ?
উলঙ্গ সন্ন্যাসী হাসে আর্তিতে আমার।

মতি মুখোপাধ্যায়

হার্দ্য

জলের শরীরে পেতে সিঁড়ি
কে যায়, বাতাস
জলের শিয়রে পেতে পিঁড়ি
কেন তার শ্বাস ?

জলের অঢেল কালো চুলে
বাতাসের হাত
যেন সারারাত
ঘুমোতে গিয়েছে সেই ভুলে।

জলের অসুখ, তবে কেন জল
বাতাসের স্পর্শে উজ্জ্বল ?

বিনিময়

ইচ্ছে করে সব দিয়ে যাই
যা'কিছু নিজস্ব থাকে সেইগুলি
অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম
ঘরবাড়ি, ব্যাঙ্কবই, বিষণ্ণ গোধূলি
অর্জিত ভালোবাসা, নারী ও সঙ্গম
চায়ের তলানি যেটা সেই সম্মান
সুদুর্লভ মানব-জীবনে
অভাবিত শূন্য উদ্যান
এমন কি ধূলিকণা, যেটুকু কুড়োই।

বিনিময় মূল্য কিছু জানা আছে
মহাশয়, এতো জানা
দূরে কাছে অসম্ভব ঢেউ
ঝুলিয়ার হাতে হাত
—পার হবে কেউ?

কালীকৃষ্ণ গুহ

নির্বাসন নাম ডাকনাম

একদিন হাওয়ার ভিতর আমি আমার মুখ রেখেছিলুম, সেই
নির্বাসনের দিন, সেই
নাম, ডাক-নাম, সত্তা—

পাথরের মূর্তি, শিলা, বৃষ্টিতে ভেজা
পাথর, সেই
অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েই নাম ধরে ডেকেছি—

'সমস্ত উঠোন'ফুল ছড়ানো রয়েছে, সবই তো
তোমার'—এই কথার বিনিময়ে
ডেকে বলেছি

'আজ নির্বাসন, আমি অনুষ্ঠানের বিধি
লঙ্ঘন করেছি, আমাকে
গৃহত্যাগের মন্ত্র দাও,' তারপর

দ্রুত হাওয়া বয়ে গেছে, আমার সমস্ত ঘরে
পাতা উড়ে এসেছে, শরীর থেকে খসে পড়েছে
উত্তরীয়—, তবু

নামে নামে ডাকা, ডাক-নাম, সত্তা—
পাথরের মূর্তি, শিলা, বৃষ্টিতে ভেজা পাথর, অন্ধকার
শান্ত নির্বাসন।

অচলায়তন

উত্তরদিকের জানলা খুলছে বলে সুভদ্র আজ ভীষণ অপরাধী।

আমাকে তুমি নতুন ভাষায় কথা বলতে শেখাও।
আমি জানলা খুলে দেখবো দূর পাহাড়ের রাস্তায়
আলো পড়েছে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে বলে আমাকে তুমি নতুন ভাষায় কথা বলতে
শেখাও। আমি দেখবো
উত্তরদিকের জানলা খুলে সুভদ্র আজ তাকিয়ে আছে দূরে, ভীষণ
আনন্দিত

২
দূর পাহাড়ের আলোয় তাকে মেলে ধরবো আজ। তাকে দেখবো
শোণপাংশু কিশোর কিভাবে
মুক্তি দিতে পারে।

তুমি আমাকে প্রথমদিনের পরিচয়ে চিনতে পারো নি। আজ
দ্বিতীয় পরিচয় হবে

ছন্নছাড়া, পাগল-বেশে।

আজ আমরা রাস্তা থেকে অচলায়তন ভেঙে পড়ছে দেখতে পাবো।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আমি ও বেড়াল

একটানা একভাবে বসে থাকতে থাকতে আমি উঠে পড়ি চেয়ার বদলে নিই
দেখি শার্শির বাইরে এই শহর ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে শহরতলির দিকে, আর
দ্রুত এগিয়ে আসছে হেমন্তের দিন
সবই কেমন ব্যক্তিগত শান্ত অভিমানী
কখনো কখনো ঝুলবারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়াই, সবার চলাফেরা
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি আমি
কম-বেশী সুখী দুঃখী মানুষ রাস্তায় ঘোরে
কম-বেশী দুঃখী সুখী মানুষ বাড়ি ফিরে ঘন ঘন জল খায়
আর এক সময় ঝিমিয়ে আসে আমার মাথা তবু
স্বপ্ন শুরু হওয়ার আগে উঠে বসি
আয়নার সামনে দাঁড়াই
চোখ চলে না নিজের ভেতর-দিগন্তে কিছুতেই বুঝতে পারি না
কোনখান থেকে সব কিছু উঠে আসে শুধু
খরখর করে মণির ভেতর মণি
জিবের ওপর আলজিব আর
হিম হ'য়ে আসে বুক
দূরে চাঁদ শীতে নষ্ট হয়
দূরে চাঁদ শীতে নষ্ট হয়, দূরে চাঁদ
চেয়ারের কোণ ঘেঁষে আমি জবুথবু হ'য়ে ব'সে থাকি
অন্যকোণে আমার ঐ আধিদৈবিক বেড়াল
কখনো সামনে কখনো অনেক দূরে
আচমকা
বেজে ওঠে বাতাসের খর গান

মেশিন

একটা মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা পৃথিবীতে
মেশিন ভাই-বোন, মেশিন স্বামী-স্ত্রী ও মেশিন মা-বাপ
ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ। ওই,
একটা জাহাজ ভেসে উঠলো আবার সমুদ্রে, ওতে আসছে
নতুন আর এক ঝাঁক মেশিন ;
তুমি চেয়েছিলে কোলের ওপর
ছোট্ট এক হাতের হাত নাড়া, যা আমি এতদিন কিছুতেই
দিতে পারি নি তোমাকে,
আজ ওই নতুন মেশিন থেকে এসে, সে
তোমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কি
তোমার কান্নাও
আমি দেখতে পাই না আর, শুধু শব্দ হয় ঠক ঠক,
চোখ থেকে হাতের ওপর
পাথর গড়িয়ে পড়ে। শুধু শব্দ হয় ঠকাস ঠকাস, আর
একা এক রোবোট হেঁটে যায় আমাদের চারিদিকে। ওই—
সে টিপে দিচ্ছে
সুইচ, এক্ষুনি আমরা আবার হাত-পা নাড়বো, ঘুষি পাকাবো,
কাজ করবো কাজ, তারপর যখন ফুটবে মেশিনের ফুল,
তুমি দ্রুত
তৈরী হয়ে নিও, আমরা ঘুরে আসবো মেশিনবৌদির বাড়ি।

অশোক দত্তচৌধুরী

রূপ

তীব্র আগুনের মধ্য থেকে রূপ উঠে আসে
প্রকৃতি জানে রূপ শুকনো খড়, পাতায় আগুন ধরিয়ে দেয়
হু-হু হাওয়ায় মাঠ পেরিয়ে
দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে ছুটে চলে।
আর যে-মানুষ মনে-মনে হেঁটে এসেছে
উত্তর-দক্ষিণের গণতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক রাজ্যগুলি
লাল-হলদে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে কিছুক্ষণ
একদিন এক-একা হাত পুড়িয়েছে, তার আগুনে।
ব'লেছে, কোনোদিন ঐ হাত লিখবে না
ভালোবাসার পঙ্‌ক্তি
ঐ হাত স্পর্শ করার লোভ ক'রেছে
ছিন্নমূল।

সে জানে আর প্রকৃতি জানে
হু-হু হাওয়ায় ক্রমাগত জ্বলে ওঠে চারিদিক
রূপ ছুটে চলে কোন্‌দিকে, কতদূর।

কলকাতা আমার

কলকাতা আমার, আমি জনারণ্যে প্রতিদিন হাঁটি
আমাকে দেখেনা কেউ, অথবা আমার উপস্থিতি
হেমনীল বিদ্ধ অঙ্গুরীয় !
আমি ঘুমন্ত মানুষের চোখে বুঁদ আফিঙের ফুল
তুলি অন্ধকার।

ফুল ফোটে ফুল ফোটে
আমি দূরের রাস্তার থেকে দেখি, নারী জানলা খুলে দেয় অন্তরাল।
শেষ প্রসাধন শেষ ক'রে, নারী, তুমি হও নগ্ন
এই রাত্রি কলকাতা, উপাসনা একটি নক্ষত্রের
আমার বাড়ির রাস্তা
ঘরে ফেরা প্রতি রাত্রি, কলকাতা আমার।
আজন্ম বিলাসী কক্ষে, হিংস্র থাবা তোলে বন্দীশালার এক
পোষা কুকুর, প্রভুর কন্যার স্তন ব্যথা পায়।
যেন আমারই চোখের ভাষা উচ্চারণ, ভেঙে দাও এই বন্দীশালা
যে-কিশোর গ্রামের দুর্দান্ত পথে চলে গেছে, আমন ধান্যের বীজ
ছড়াবে দু'হাতে একদিন।
আরোহ প্রতিম নাচ হবে, ঐ খোলা মাঠে আমাদের নিসর্গ মিলন
ঘরে ফেরা পথে, আলো জ্বলা আর নেভা
কলকাতা আমার, মনে হয়, সঠিক নির্ভুল পথে
আমি আজ একমাত্র স্থির তোমাকেই চিনি।

শামসের আনোয়ার

এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা

কোনো বিদর্ভ নগরী আমার স্বপ্নের ভিতর জেগে ওঠে না
ইতিহাসে কোনো অর্থ নেই মূঢ়তা ও ভ্রান্তি ছাড়া
যে নারী আমাকে পথে বসালো তার ক্রূর হাসির ছাপ
লেগে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়
আমি জানি মানুষের কোনো উত্তরণ ক্লিওর আঁচলে বাঁধা নেই
এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের
অপেক্ষা আমি রাখি না
নরম বৃষ্টির মধ্যে একান্ত দুঃখিত লোকের মতন আমি
মাথা নিচু ক'রে হেঁটে যাই
গুলি না খেয়েও আমার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে
ফেঁসে যাওয়া হৃৎপিণ্ড দুহাতে চেপে ধ'রে আমার
রোজ রাতে বাড়ি ফেরা
পদধ্বনি মৃত্যুর মতন অতি গম্ভীর বেজে ওঠে ও দূরের ফুটপাথের দিকে
চ'লে যায়
নিঃসঙ্গতার কাছে এরকম ফিরে আসার নামই যদি ইতিহাস
তবে আমি নিশ্চয়ই ইতিহাস মানি
বীতশোক অশোক বা টায়ার সমুদ্র পারে কোনো প্রাসাদের খবর
আমার জানা নেই
আমার বিছানার পাশে বনলতা সেন নয় কোনো এক জলজ্যান্ত
পাপিয়া বসুর মণ্ডুকের মতো দুই স্তন ওৎ পেতে থাকে
শস্তা তেলের দুর্গন্ধে বিদিশার নিশা খুঁজতে গিয়েই আমি
অপ্রতিভ হেসে ফেলি
পায়ের নিচেই ক্ষুরধার রোদ, আমি বলতে পারি না আহা
বাইরে কি মনোরম বৃষ্টি
প্রেম আর স্মৃতি আমি উড়িয়ে দিয়েছি সিগারেটের ধোঁয়ায়
জ্বর আসে নি তবুও আমি জ্বরের ঘোরেই বাঁচি

মদের ঘোরে ভাঁড়ামো ক'রে আমার দুপুর কাটে
মাড়ওয়ারি দম্পতির নির্লজ্জ সংগম দেখে ছাদের ওপর
রাত্রির প্রহর পুড়ে যায়

ব্যর্থতা ও গ্লানির ক্ষুধায় হস্তমৈথুনের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েই
আমি পুনরায় ব্যর্থতা ও গ্লানির নিঃসীম তটে ফিরে আসি
খোলা ব্লেড দেখলেই তৃষায় আমার গলা জ্বলে
পাখার হুক দেখলে মনে পড়ে যায় সোনালি ফাঁসের কথা
এমন কি মায়ের মুখও চিনতে পারি না
মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, কে এই মহিলা
আমি এর শরীরের অংশ ছিলাম অথচ এর মনে নেই,
জানে না রোজ রাত ২টোর সময় আমার দুচোখের পাতা বেয়ে
তারই বুকের রক্ত ঝরে

মশারির পাশে ঘাতকের মতো চুপি-চুপি কে যেন এসে দাঁড়ায়
হাতে ছুরি অনিমেষ চোখ জ্বলে মুখের ওপর
বৃষ্টি আর কুয়াশার ল্যাম্প-পোস্টের নিচে বাইশ বছর
দাঁড়িয়ে আছি ভীষণ নিঃসঙ্গ

ঘাড় কাত ক'রে দেখে চলেছি দুঃখের যত কাটাকাটি খেলা
বৃষ্টি আর কুয়াশায় বাইশ বছর এরকম দাঁড়িয়ে থাকার পর
একদিন আমি ঘুমের মধ্যেই খুন হয়ে যাবো
এই বিমর্ষ ছবির নাম যদি ইতিহাস, তবে আমি নিশ্চয়ই ইতিহাস মানি.
যে সৃষ্টি আর সভ্যতা আমার বুকের বাইরে গ'ড়ে উঠেছে
তার প্রতি আমার বুকের কোনো মায়া নেই
কলকাতা আর আমার এই নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের
অপেক্ষা আমি রাখি না ।।

স্থতোর গান

ফরেস্ট-বাংলোয়, হুইস্কির গ্লাস সাজিয়ে, তিনজন কবি স্থতোর গান শোনার চেষ্টা করছেন। কাল তারা নদীর ধারে গিয়েছিলেন ঐ উদ্দেশ্যে, এরপর তারা চলে যাবেন পাহাড়ে—যে যার প্রক্রিয়ায় স্থতোর গান খোঁজার চেষ্টা করবেন। আর তখন, এই কলকাতা শহরেই রীনা বৌদির পেটে গোপন ও সূক্ষ্ম মোচড় দিয়ে স্থতো হঠাৎ গান ক'রে ওঠে ; কিংবা লিফ্‌ট-এ হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল একদল ছেলেমেয়ে, বাইরে দাঁড়িয়ে যারা হাত নাড়ছিল, তাদের একজন লিফ্‌টএর ভিতরের একজনের হাতের সঙ্গে দু-চারটে জরুরী কথা শেষ করতেই, অমনি স্থতো মহানন্দে ডিগবাজি খেয়ে গান শুরু করে দেয় ; কিংবা সন্ধ্যায় টেলিফোন বেজে উঠলে, ছেলেটি ভারি গলায়, হ্যাঁ! তারপর, কি মনে করে ? ফোনের ওপাশ থেকে, 'ঠিক মতন বাড়ি পৌছেছ ?' ছেলেটি : 'আরে! কাল তো ওখানেই ছিলাম। কিরকম যেন মাতাল হয়ে গেলাম শেষের দিকটায়। সকালে, তোমাদের ওখান থেকে ব্রেকফাস্ট করেই তো বেরুলাম!' মেয়েটি : 'ও আচ্ছা! এমন বোকা হয়ে গেছি না আমি! তোমাকে এর জন্য ফোন করা যায় না বুঝি ?' শুনেই, মিহি গলায়, একটা ভারি অস্বস্তি-র, একটা ভারি ছটফটানির গান আরম্ভ ক'রে দেয় স্থতো। স্থতোর গানে ভর্তি এই শহর ছেড়ে, তিনজন কবি ; নদী, পাহাড় ও বনে, ঐ গান খুঁজে বের করার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যান।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

যেভাবে কবিতা লেখা হয়

জীবনের অর্থ কি শুধু নিরন্তর লড়াই, আর কিছু নয় !
মাকে বলেছিলুম এই যে আমার বয়স হল
তুমি একে মেনে নিয়ো, সহজভাবে মেনে নিয়ো
আমার অন্যান্য বোকামিগুলো, আমি সজ্ঞানে জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে
বাঁচতে চাইনি বাঁচাতে চাইনি, নিজের গূঢ় অস্তিত্ব সমেত তবে কি
আমি মরে গেছি ! উচ্চাশার মৃত্যু মানে মানুষের মৃত্যু !
সব কিছু হাস্যকর আজ ১৯৬৭তে, এবছর বোধহয় খারাপ কাটবে,
ভালোবেসে শান্তির প্রত্যাশা করব না ভাবতেও মন খারাপ
বাস্তবিক যা কিছু ভালো ও খারাপ তা ব্যক্তিগত অর্থে বিবেচনাসাপেক্ষ,
আমি কিভাবে গ্রহণ করব তার ওপর নির্ভরশীল,
তুলনামূলক বিচারের অর্থহীনতা

ভালোবাসা যখন ডাক দিয়েছে বলেছি 'আমি আছি,
কিন্তু তুমি প্রবল হলে আমি ভেসে যাব'—
আমি ঘড়ি দেখা ভুলে গেছি, বই পড়া ভুলে গেছি
আমার নিশ্বাস বইছে, হৃৎপিণ্ডটা কাজ করছে মাত্র
কিন্তু আমি বেঁচে নেই, এরকম জীবন্মৃত
স্নানঘরে তিন ঘণ্টা শুয়ে আছি জলের প্রবাহে···স্নানঘর থেকে ফিরে
দ্রুত কয়েক লাইন লিখে ফেললুম—
জীবনের মতো অগোছালো, জীবনের মতো অনিশ্চিত
সহজ অথচ জটিল
যা পরে কবিতায় বসিয়ে দেওয়া যাবে।

বিস্ফোরণ

একটি রিভলভার সে সব সময় কাছে রাখে !
কিন্তু কেন ? হেমন্তের বিষ ওই নেমে আসে নদীর উপর,
আরক্তিম জল। পানশালা
তার ছোট্ট হাতব্যাগের মধ্যে সব সময় খচখচ করে
একটি রিভলভার।

সততার মুখোশ পরা মানুষ শোনো আত্মহননের গান ;
এ পর্যন্ত তোমরা তাকে দাওনি কোনো শাস্তি,
করেছ অনেক অবিচার ; চক্রান্তের জাল তাকে ঘিরে
নিন্দা উপহাস— বেগুনি আকাশ থেকে
আরেক বেগুনি বিচ্ছিন্ন আকাশে ঘুম নেমে আসে, শান্তি
পাখির আকাশের মতো ডুবসাঁতার দিতে চায় সৌরনীলিমায়
তার মন, জীবনের মহিমার নীলিমার মুখোমুখি না হয়ে এখন
রিক্ত তিক্ত একটি ধাতব রিভলভারের মুখোমুখি দাঁড়াল কেমন !
ম্লান হয়ে যায় সন্ধ্যা, আরক্তিম জল
যাবতীয় রুক্ষ কোলাহল বন্ধ হয়
শহর মরা শহর, মানুষহীন শহর
একটি চিলের কান্না নিয়ে তাকে
ঘুরতে দেখা যায় সারা দুপুর
সারা দুপুর এখন মাথার উপর রৌদ্র, খররৌদ্র
ধুধু নির্জন রাজপথে অট্টালিকার ছায়া
মরা কালো কাক, বেহালার ছড় পড়ে আছে···
একটি গুলির শব্দ গোটা একটি শহরকে গুঁড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট

ভাস্কর চক্রবর্তী

হায়, জীবন

জানি না আমি, আজ সন্ধেবেলা কী ভেঙে পড়বে আকাশ থেকে—
মোটরগাড়ি, ল্যাম্প-পোস্টের ভেতর দিয়ে
দেখি, কলকাতার দিকে চলে গেলো—আমাকেও ঐরকম
কলকাতার দিকে চলে যেতে দাও—ছাব্বিশবছর, শেষ হতে চললো আমার
হে ঈশ্বর, আমি জানি—আটাশবছর, তিরিশবছর, এইরকমভাবেই
কেটে যাবে আমার—আমার পা
বিকেলের আলোয় খোলাখুলি ছড়িয়ে থাকবে বিছানার ওপর
হাত, অলসভাবে তুলে নেবে জলের গেলাস—দূরে, বহুদূরের
সেই দিনও হয়তো থম্‌থম্ করবে এই রকম—মাথার ওপর দিয়ে, দ্রুত
চকিতে উড়ে যাবে, মুখর উড়োজাহাজ—আমার ভালোবাসা
আবার আমি ফিরে পাবো কি কোনোদিন? জানি না
জানি না আমি, কোন্ শুভ্র হাত থেকে
ঝড়ে পড়ে ভালোবাসার সবুজ তৃণ—কোন্ অলৌকিক আলোয়, কুষ্ঠ রোগী
মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে—আশেপাশে
কেউ থাকে না আজকাল, কেউ নয়—
মানুষের থেকে, আরও নিপুণভাবে লুকিয়ে পড়া শিখে নিয়েছে
এমন কি বিড়ালগুলো—অনেক চিঠি লেখা
শেষ হলো আমার—জানলার পাশে বসে শেষ হলো আমার, অনেক
ভাঙা দুপুর—আমার এই ঘর
আমি ছেড়ে যাবো একদিন—আমার চেয়ার থেকে নিঃশব্দে উঠে, একদিন
আমি অদ্ভুত নির্বাসনে চলে যাবো—গ্রীষ্মের দুপুরে
কুকুরগুলো ঝিমোতে ঝিমোতে অতীতের কথা ভাবে? আমি জানি না
জানি না আমি—অর্থহীন বারান্দা
শুধু শুধুই জেগে ওঠে আমার বুকের ভেতর—হায়, জীবন
আর কিছুই মনে পড়ে না আমার—আমার কিছুই মনে পড়ে না আর

আরেকটি প্রেমের কবিতা

আবার অনেকদিন পরে দেখা হলো—শীতের সন্ধ্যায়। চলো যাবে ? যাবে নাকি ?
বিবাহ কি আজো আর তেমন ঘটনা ?
এখনো তোমার পাশাপাশি চুপচাপ হেঁটে যেতে ইচ্ছে হয়।
রাস্তার দু'ধারে গাছ, জনশূন্যতায়, আজো তারা চায় নাকি আমাদের ?
আমার কেটেছে দিন আমার কেটেছে রাত—স্বপ্নহীন—শুধু স্বপ্ন নিয়ে।
শীতের বাতাস এসে তছনছ করেছে কি তোমাকে কখনো ?
একা জেগে কাটিয়েছো সারারাত জানালার পাশে ?
ছাখো ছাখো, বৃষ্টি এলো। তোমার চাদর কেন ঠিকঠাক জড়িয়ে নিলে না ?
এখন উন্মাদ নই আমি আর—
এখন আমার কাছে ট্যাবলেট, আর ট্রাম, কলকাতা, মানুষের
শূন্য মুখ বিষাদ, হর্ষের !
আবার অনেকদিন পরে দেখা হবে।
তুমি ঠিক ব্যস্ত খুব যে-সময় তোমার স্বামীর গল্প নিয়ে
ঝুলিয়ার পাশে একা তোমার দাঁড়িয়ে-থাকা ফটো আমি পকেটে পুরেছি

ভাবি শুধু, কোনোদিন ফেরত দেবো না।

দেবারতি মিত্র

কৃত্তিবাস আমাদের কমলালেবু বাগান

কমলালেবুর বাগান দেখে বেড়াতে এলাম
এ কোন্ জায়গা নাম জানি না,
রঙবেরঙের পায়রা যেন উড়ছে পাহাড়
কোঁকড়ানো ঘাড়, বরফ জমে—
চড়ার ওপর ওঠা যাবে কি আলোকবর্ষ-টর্ষের কমে !

তবুও উঠছি, দৌড়োদৌড়ি, লাফিয়ে নামি
ঢালুর দিকে উল্টোপাল্টা ছুটতে থাকি
পরস্পরের চোখের তারায় রাস্তা আঁকি
লালচে হলুদ ফুলের বৃন্তে আমরা ক'জন
ঘুম জাগরণ কিচ্ছু বুঝি না, কেবল ছুটি, ঠিকরে উঠি
আতুর আকাশ, আতুর তারা, রোদ জ্বলজ্বল সমুদ্রজল
ঢল আসে উঁচু পাগর ডিঙিয়ে
মহুয়া, নারঙ ঘোড়ার কেশর
টুং টাং টুং লাল রুপো স্বর
একটি তরুণী একটি তরুণ···
অশেষ তরুণ অশেষ তরুণী
রক্ত প্রপাত—ঝম্পক গুলি ।

সূর্য ছুঁড়ছি কমলালেবু লোফালুফি করি
এ ওর দিকে,
এ ওর কাছে শিখছি খেলা সমস্তদিন
এ ওর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে টানি
চিন চিন করে মদ আসে, আসে মিষ্টি রক্ত কমলালেবুর
গাছের শিকড় আর কতদূর ?

কিশোরীর ফুল

এত স্বল্পবাসা কিশোরীরা রাস্তায় এসেছে
তা কি করে সম্ভব ?
সামনের দিকে ঘুম-ফ্রকের বোতাম খোলা
দেখা যাচ্ছে সবে ফোটা ফুল
হাওয়ায় ভাসছে খুব ফুরফুরে ঠাণ্ডা
আতপ্তকাঞ্চনরঙা ছোট্ট হালকা স্তন
ফুটকি ফুটকি কত সংখ্যাহীন আবছা হলুদকুচি মৃদু

অতসী গাছের চেয়ে কিছু বড়
একটি লাজুক গাছ হাতছানি দিয়ে ডাকে—
গোছা গোছা পাতাসুদ্ধু শাখাগুলি পাগলী কিশোরী
নতুন উজ্জ্বল স্তন উড়ুউড়ু ফিকে টিউ ফুল
ক'টি স্তন ক'টি বা কিশোরী
এক তুই তিন চার পাঁচ ছয়...
গোনার আগেই
খেয়ালী ন' নম্বর দক্ষিণ-পুব দিকে
নিয়ে চলে গেল

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

হঠাৎ কোন্ হিরণ্ময়

চতুর্দিকে হল্লা করে মানুষ যাচ্ছে হাটে
আমি শুয়ে চিৎপটাং খাটে
সরলরেখায় টেনে নামাই সামান্য বিন্দুকে
হাজার রকম ব্যাখ্যা করে হাজারটা নিন্দুকে
এটা গেলো, ওটা রইলো, জানিতো সবই-তা
তুই আমার কবিতা।

কারা যেন বাড়ি করছে গগন-চুম্বী আশায়
আমি তখন ব্যস্ত থাকি আরেক ভালোবাসায়
হঠযোগীর মতন আমি রাংতা করি সোনা
ভেতর জুড়ে ব্যস্ত আনাগোনা
রয়ে গেলাম অপেক্ষমান শ্যামা কিংবা রামার
কবিতা তুই আমার!

মহোৎসবের বাজনা বাজে মানুষ যেথায় থাকে
আমি কেবল দৈব-দুর্বিপাকে
চতুর্দিকের ভয়-জাগানো হাজার রকম তাড়ায়
গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছি, ভট্টাচার্য-পাড়ায়
হঠাৎ কোন্ হিরণ্ময় রহস্য আলোকে
পেয়ে গেলাম তোকে।

ভালোবাসাবিষয়ক

বারান্দায় দড়ি বেঁধে ভালোবাসা শুকাতে দিয়েছি
ভালোবাসা মানে কোনো চারুবল্লী শরীরের কাছে
সরম-ঘুচানো আকিঞ্চন
ভালোবাসা মানে কোনো বসন্তের দৈবাৎ বাতাসে
কিছুটা নিশ্বাস ছুঁড়ে দেওয়া
মাঘী পূর্ণিমার রাতে স্নান সেরে
হিহি শীতে আগুন পোহানো
ভালোবাসা মানে···
থাক মানে
আমি তো তেমন কোনো প্রণয়ের পুত্তলিকা করিনি তোমাকে
বরং পোর্টমেণ্টো ভেঙে পেড়ে আনি পুরোনো পোশাক
গায়ে দিই,
শীত চলে গেলে তাকে পুনরায় ভাঁজ করে রাখি
তোমার বিন্যস্ত ঠোঁটে চুমো খাই গৃহস্থের মতো
পোষা বেড়ালের মতো ভালোবাসা শুয়ে থাকে
বারান্দার কোণে
এবং রোদ্দুর মরে গেলে
ভালোবাসা ঘরে উঠে আসে।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

অসম্ভব কবিতার জন্য

অসম্ভব কবিতা এখনও লিখতে পারিনি, তিরিশ বছর হলো
ছুঁই ছুঁই করছে মুখ, ঘুণপোকা কাটছে কবিতার শব্দগুলি
তবে কি পারব না লিখতে যা আমি লিখতে চাই
যা আমি লিখতে লিখতেও লিখতে পারি না
এরকমভাবে বুকে ব্যথা হয়, করুণা করেও কেউ ছুঁড়ে দেয় না
বাসীফুলের মালা

এখন আমি কি করব, কিছুই বুঝতে পারি না
মাঝরাতে বুকের মধ্যিখানে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ হয়
উঠে পড়ি, ঢকঢক জল খাই, দাঁতের মাজনের কৌটো খোলা পড়ে থাকে
শব্দ নিয়ে খেলায় মেতে উঠি,
অসম্ভব কবিতা এখনও লিখতে পারি না
তবু কেন আসছে তিরিশ বছর ?

কি বর্ণের ঘুম

কি বর্ণের ঘুম তুমি ভালোবাসো ?
নদীর স্বচ্ছতা চোখের ভেতর ঘুম এনে দেয়—
ভালোবাসা রঙিন ঘুম, বহুবর্ণের ঘুম
যেন আজকাল ঘুমহীনতা রক্তের ভেতর এনে দেয় সন্ন্যাস-

কি স্বর তুলেছো আনন্দলোকের নারী ?
কালোরঙের উত্তরীয় মাটি ভেদ করে উড়ছে হাওয়ায়
কি বর্ণের ঘুম উঠে আসে ধীবরের জালে ?

এই তো অবসর, হাওয়ায় মিলে যায় শ্বাস
কি বর্ণের ঘুম প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে
হাতে হাত হেঁটে যাওয়া লাল রঙের ধুলোয় ?

শম্ভু রক্ষিত

ধাতব উচ্চারণ

কবিতা লেখার সময় কবিদের বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে
হিংস্র ঘূর্ণি রুগীর মত
ধোঁয়ার চাদর মোড়া নগরীর ওপর পড়ে বেঁচে থাকে
আলোর গহীনে গিয়ে ডোবে
বা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে খুঁড়ে ছাখে হাড়

কবিতা লেখার সময় কবিরা মানুষের হৃদয়ে ঘোরে ফেরে
নিজের অরণ্যে
বা যন্ত্রণার অনুগামী অভিসারে জ্বলে ওঠে
আগ্নেয় পাহাড়ে শুয়ে মাথা রাখে
ভাবনা ও ধ্বনির মধ্যে বা নিজের ভিতরে বাইরে ডুবে থাকে

কবিতা লেখার সময় কবিরা বিশুদ্ধ প্রান্তরে
জেগে ওঠে খেলা করে
নিরুত্তাপ দূরেব আঁধার থেকে কবিত্ব টেনে আনে
এক সমুদ্র গর্জন কবিদের কানে এসে লাগে
অতীতের দিনগুলো তাড়া করে তারা ছোটে
তাদের মুখে জ্যোতি ফুটে ওঠে
চর্মসার কদর্য পুঁটলি খুলে তারা আগুনের ভাঁড় বের করে
বা যথাসাধ্য চেষ্টা করে
বা তারা বমি করে শতাব্দীর চক্ষুময় কাঁচে

কবিতা লেখার সময় কবিদের বুক অনুভূতিতে কাঁপে
কবিদের বুক থেকে স্মৃতির মতো
গুলির শব্দ চিৎকার উঠে আসে

অজ
আর কবিদের জন্যেই পৃথিবীর বয়স বাড়ছে

রাজনীতিবিদরা

রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক রাজধানীতে বাস করে
রাজনীতিবিদরা এক বিভবশালী বিবুধের দ্বারে বসে
প্রেরণাপূর্ণ নরক স্থষ্টি করে
রাজনীতিবিদরা দেশপ্রেমসমৃদ্ধ গ্রাম ও শহরের মানুষদের শেখায়
'নিতান্তই দলের একজন লোক'— তাদেরই দুর্দশার হেতু।

যারা কোন শিশুদর্শকদের হয়ে ছবি আঁকে না
বা লাথিয়ে খামচে চেঁচিয়ে হাড় ভাঙবার যোগাড় করে না
রাজনীতিবিদরা সাধারণতঃ তাদের উপর নির্ভর করে না
জনগণ নামক শ্রবণ যন্ত্রে সাড়া জাগাবার উদ্দেশ্যে
রাজনীতিবিদরা কাগজে বেতারে পাঠায়
দেশ স্বাধীনতা পৃথিবী মঙ্গল বিষয়ে বিষ-অভিজ্ঞতা

রাজনীতিবিদরা রচনা করে এখনও কারাগা'র
পশু-সংস্করণ, রাক্ষস খোক্কসের স্থষ্টি রহস্যের আদিকাণ্ড

তারা আধা পুরোন সমাজের মায়া পঞ্জিকার ভেতরে এখনও লুকিয়ে থাকে

অমিতাভ গুপ্ত

ভাঙা রাস্তা

গলির মোড়ে ডানদিকে যাও বাঁদিকে যাও ডাইনে ফেরো
বাঁয়ে পেছোও লাফিয়ে ওঠো ডিগবাজি খাও আঁস্তাকুড়ের
আড়াল থেকে পিছলে এসো সবুজ দেয়াল শ্যাওলাধরা

চায়ের দোকান মাস্তানেরা জিহ্বা চাঁছে চায়ের কাপে
নোংরা ঠোঁটের ছোপ পড়েছে গড়িয়ে পড়ে পুঁজের মতো
নিয়ন আলো পেঁয়াজকুচি রাইসরিষা টুকরো শসা

ডানদিকে যাও এগিয়ে এসো বাঁদিক দিয়ে মুণ্ডু ঘোরাও
বৃহন্নলার বয়েস বাড়ে তোমার কী সাধ বাড়ে তেমন
তেসরা বাড়ি পেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে মাথার উপর

জানলা খোলা বাঁদিকে যাও জানলা খোলা ডাইনে হটো
বাড়ির সদর কুলুপ আঁটা কিন্তু লোহার শেকল জুড়ে
জ্বলছে আগুন জানলা দিয়ে দিচ্ছে উঁকি সাপের ছবি।

ঝরা মানুষ

ভাঙা মানুষের কাটা মানুষের
ঝরা মানুষের গানে
একদিন এই পৃথিবী মুখর হবে।
একদিন, আরো কত অস্থির
অপেক্ষা শেষ হলে
মানুষের গান পাবে অমলিন
অগ্নির ব্যাপকতা।
আজ তারা শুধু কীর্তিনাশার
অকূলের মাঝখানে।

ঢেউ ভেঙে যায়, তীর ঝরে যায়
হয়ত' মানুষও মরে
তবু কী দীপ্ত, অবিনাশী প্রাণ
জ্বলে ওঠে চরাচরে।
তরঙ্গ হ'তে তরঙ্গে আর
ঢেউ হ'তে দূর ঢেউয়ে
যারা চলে যায়, সকলে ফেরে না
তবু সহস্র ফেরে।
তারা বেঁচে ওঠে, তারা বেঁচে থাকে,
গান গেয়ে ধান কাটে।

সুব্রত রুদ্র

স্তব্ধতার পড়াশুনো

১

আমার গা শুঁকছে হাওয়া নিরীহ, কখনো ইচ্ছেমত
নিজেকে হারিয়ে ফেলে
তার হদিস খানিক দূর অব্দি কোথায় মুহূর্তে উধাও
নজর পড়ে না।
তখন যেন সমস্ত অপ্রয়োজন হাওয়ার আবর্তে বেরিয়ে এসে হাসল।
উড়তে থাকা ধবধবে আকাশের বাইরে
সেরকম একই নিশ্বাস হয়তো মুক্ত রাখে অভিব্যক্তি !

২

শব্দ বিলীন হওয়া কেউ হবে দূরের গাছগুলো।
দেখি, কাকের বসা— উড়ে যাওয়া, অযথা
গাছের পাতা ঝরা, এইসব,
হাওয়ার সঙ্গে আরেক হাওয়ার ভাব, জড়াজড়ি।
অনেক সময় নিজে ধাক্কা মেরে দেখেছি
হাওয়ার ঘুম বাড়াবাড়িই মনে হয়।
দূরের হাওয়া এতটুকু সময় অহংকার করতে
পারলো না !
হাওয়ার অনুভবের ভিতর যেটা দেখা দিয়েছে
অবিরোধ ভাব,
আমরা বোধহয় ওদের কোথাও নিয়ে
গেছি অথচ এক তানতা
সঙ্গে সঙ্গে আবার !
তেমনি হাওয়া যেমন।

আকাশের গায়ে কামড় শব্দহীন স্তব্ধতা
আরো এগিয়ে যাই, অন্ধকার থাকবে শব্দ এতোটা পথ।

রাত্রে আমার ঘুম ভাঙে ধারালো অন্ধকার দেখলাম
ছড়িয়ে পড়া সংযোজিত সময়, সেও তো
অনেক দিনের কত উচ্ছল।
গরম দীর্ঘায়ত হাওয়া উঠছে। ফাঁকা দিগন্ত ঘরময়
শব্দ ছাড়া এই ধরনের অন্য কিছু
বলার মতো হাঁসফাঁস করত হাওয়া।

৪

পৃথিবীর যত খারাপ খবর আছে সব আমি একদিন
ছিঁড়ে ফেলবো।
বেশ হাওয়া দিচ্ছে, সামনে রাস্তার ধারে বসি
অন্ধকারে ফিসফিস ক'রে কথা হয়,
গাছেদের যে সমস্ত নাম ধরে এতকাল ডেকেছি
যেমন, অশ্বথ বট দেবদারু সেগুলো তাদের নাম নয়, তারা
কেউ সাড়া দেয়নি।
সন্ধের মুখে বুঝতে পারা হাওয়ার সঙ্কোচ,
আমার নিশ্বাস, পৌঁছেছি সেখান থেকে বৃষ্টির ওই দূরাঞ্চল···
গাছের আড়ালে আরো গাছের হাওয়া, কোনো-না-কোনো কান্না হবারই কথা।

রণজিৎ দাশ

আমাদের লাজুক কবিতা

আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাতে শুয়ে থাকো কিছুকাল
তোমার লাজুক পেটে লাথি মেরে হেঁটে যাক বাজারের থলে-হাতে
বিষণ্ণ মানুষ
শুদ্ধ প্রণয়ভুক তোমার শরীরে কেউ ছ্যাঁকা দিক বিড়ি জেলে—
নিতান্ত ঠাট্টায়
তুমি স্থির শুয়ে থাকো, কষ্ট সয়ে, মানুষের দীর্ঘতম ফুটপাত জুড়ে
শুধু লক্ষ্য রেখো, অন্ধে না হোঁচট খায়, কোনো ভিক্ষাপাত্র ভুল করে
তোমার কাছে না চলে আসে
ধীরে ধীরে রোদ-ঝড়-শীতের কামড়ে তোমার সোনার অঙ্গ কালি হবে
ওই পোড়ামুখে তবে ফুটবে তামাটে আভা পৃথিবীর, তাই দেখে
ফুটপাতশিশুরা ভারি ঝলমলে হাততালি দেবে
তাদেরকে দিও তুমি ছন্দজ্ঞান, লজেন্স দিও না

সেই বন্ধুটির গল্প

আমি কি জেনেছি সব— কোন্ ফুটপাতে সেই বন্ধুটির রক্তাক্ত রুমাল
সঙ্কেতচিহ্নের মতো পড়েছিল, কেন তার গন্ধ শুঁকে শুঁকে
প্রসূতিসদনে গিয়ে থেমেছিল সরকারী কুকুর ?
(ধর্মযাজকের মতো সেই কুকুরের মুখ নিউজপেপারে নাকি অনেক দেখেছে।)
সে কি ভূতগ্রস্ত ? কেন পড়েছিল রক্তপুঁথি, কালোবাজারের দেশে
চেয়েছিল কৃষক বিপ্লব ?

আমি কি জেনেছি তার— সেই বন্ধুটির—গুপ্তঘাঁটি কোন্ গ্রামে,
কোন্ সূর্যালোকে ?

সে কি কোনো মধ্যরাতে খড়বিচুলির পাশে ভ্রান্ত মানুষের মতো জেগে ওঠে, একা ?
কিংবা স্বপ্ন দেখে— এক গোপন পাহাড় প্রতিদিন
শহরতলির পথে ছায়া ফেলে, থানাপুলিশের গায়ে ছায়া ফেলে,
দূরে সাইরেন বাজে— ঘোর সন্ধ্যাবেলা !

কবিতা লেখার পর সিগারেট খেতে হয়, যেমন সঙ্গম শেষে জল,
আমি সিগারেটপ্রিয়— আমি তো জেনেছি সব— সেই বন্ধুটিকে নিয়ে
কবিতা লেখার রীতি কতোখানি বাণিজ্যসফল।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

আমরণের আকাঙ্ক্ষাটি দুলছে

গাঙ্ এখানে গহীন, পাড়ের কাছে শান্ত কালো কাদা, তোর নৌকার
রশি ছিঁড়েছে, লণ্ঠনটি দুলছে চুপচাপ। কেউ কোথাও নেই রে

আরো উজান যেতে হবে, অথচ এখনো
কলাপাতার মান্দাসে মা শীতলার দয়া পেয়েছে এমন সব
শিশুর কচিমুখ ভাসছে, কাকের মুখ ভূষুণ্ডির মতো ;
তরাসে তুই কুলুঙ্গির ভিতর খুঁজিস
হলুদ কাগজে জোড়া লাল অক্ষর মন্ত্রছরি ছক, ভাগ্য যাকে বলে,
ভাতের হাঁড়ির ওপর একটা চাপা দিয়ে আবার দেখিস
মহাসাগরে মরা শিশু ও কাক চলেছে ভেসে।

আঁধার খোলা হলে, তখন আসবে পাহারাদার, গেঁজে বটুয়া
হাতড়ে দেখবে, পারানি আছে কি না। কিন্তু তুই
নৌকা বাসনি, ভেলায় চাপা রাশ-আলগা সওয়ার—
সে-ও তো বুঝবে না।

মরণ কতো গহীন, মরণও এক সুন্দরবন, মধুর লোভ দেখিয়ে
মরণ ডাকে, তুই আজ মরণেরই লোভে মরণের কাছে, তাই
পাতাটি নড়্ছে না, জংলা ঝুপ্সি দুপাড় আছে স্থির
ও মরণ, এই ত্যাখ্ শরীর, তার গ্রাম নগর নদী পুকুর দহ
কিংবা শরীর ছিঁড়েছে, আত্মাটি দুলছে চুপচাপ।

আজীবনের আকাঙ্ক্ষাটি নেইরে

ঘরে ফিরিস না, ঘরে আর কখনো ফিরবি না
ওই দূরে ঘর গাঁবসত মরামায়ের শরীরে
ও জ্বালা তোর সর্বশরীর সর্বজীবন ধরে ফুটে উঠছে

সংসারের নিমহলুদ সুখের কলাপাতায় যখন কিছু হলো না
মা শীতলার মমতা খুব, মহাসাগরে মরাসিন্ধুর মতো
গহীন ভেসে যা তুই
সঙ্গে আছে, সঙ্গে থাকবে মতিচ্ছন্ন পাহারাদার কাক

দাম্পত্য

পথ ছেড়ে এসে তুমি দেখো কি তাকে ?
রমণীরূপের কোন্ দুর্বিপাকে
জড়িয়ে গিয়েছে তার পাওনাদেনা,
পাশে যারা আছে, তারা কিছু জানে না।

পথ ফেলে এসে তুমি দেখেছ কাকে ?
পৃথিবীরূপের কোন্ জটিলতাকে
খড়কুটো করে নিলো সেই হিসেবী ?
সে-ই তো পারতো হতে দয়িতা, দেবী—

কিন্তু দুজনে এক, এই ধারণা
একেবারে ভুল আর সবশেষে, ঠিক।
কখনো মেলেনি ওরা, একবারো না—
ওদের বিবাহভূমি পশ্চিমদিক।

একরাম আলি

রাত্রি

গভীর রাতের বেলা কাদের বাড়ির ছেলে পুকুরের মাঝে ঢিল ছোঁড়ে
আমার কপাল অব্দি উঠে আসে জল, আর ভিজে যায় বিছানা-বালিশ
গলির ভিতর থেকে থপ্‌ থপ্‌ শব্দ আসে গম্ভীর পায়ের, অন্ধকারে
দরজার কড়া নাড়ে কার হাত, কার দীর্ঘ হাত
এরকম রাত্রিবেলা মসৃণ দেয়াল বেয়ে সাপের মতন
মানুষের দোতলায় উঠে যায় সাপ— খেলা করে

বৃষ্টি নামে, একটি ঘরের থেকে বেড়ে যায় আরেকটি ঘরের দূরত্ব
এরকম আঁতুবাঁতু অন্ধকারে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে কোথা যাও তুমি
'এইখানে পৃথিবীর শেষ'— ঘোষণা করেই তুমি কোথা যাও
এ-রাতের বেলা

ফিনফিনে সুতোর মতো বাতাসে দুলতে থাকে তোর পথ
ছাড়্‌ খোকা এইসব খেলা

খাদ্য ও খাদক

একদিন আমরা পাখি খেয়েছি বিস্তর, পাখির ছানাও
তাদের ডিমের গীতিমাধুর্য, আঃ, কিছুটা এখনো জিভে লেগে আছে
বংশানুক্রমিকভাবে খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক ছিল মন্দ নয়
এতোদিনের সাজানো পালকগুলি— রঙিন ও দ্যুতিময়
কিছুদিন আগে তা-ও খেয়ে ফেললুম

কিছু ঘোড়া কুয়াশায় অথবা হতেও পারে জ্যোৎস্নায়
চরছে-ভাসছে, গাঙ্গেয় কুয়াশায় ঢুকে আবার বেরিয়ে আসছে দেখে
এরপর আমরা ঘোড়াগুলি খাবার বন্দোবস্ত করি
পরিবর্তে খেয়েছি ঘোড়ার পরিপূর্ণ ডিম— তার
সাদা বহিরঙ্গ, তার হাওয়া কুসুমের ঘূর্ণি
তখন আমাদের চশমা ছিল
তখনো আমাদের বিপন্নতা ছিল

আজকাল আমরা কাঁটাঝোপ খাই প্রচুর, টেবিলে
সাজানো আছে বেশকিছু মরুভূমি, নিজস্ব জল
আমাদের এক বন্ধু দু-একটি ক্যাকটাস খেয়ে দেখেছেন
ভোরবেলা খেতে হয়, তারপর একটি স্লিম চার্মিনার
এর জন্য চার্মিনারকে আমরা দিয়ে যাচ্ছি মনীষা
কাঁটা ঝোপকে পরশ্রীকাতরতা, মরুভূমিকে নিজস্ব
স্থিতিস্থাপকতা এবং জলের শূন্যস্থানে মেধা-ছাড়া
অন্য কিছুই দিতে পারছি না নিজেকে

এখন আমরা পাখি খাই না ব'লে ডিমের গীতিমাধুর্য
দিতে পারি না
এখন আমরা হাওয়াকুসুমের ঘূর্ণি খাই না ব'লে
আমাদের চশমা নেই, বিপন্নতা নেই

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বনদেবতা

পাতা-ঝরে পড়া বনের মধ্যে ঘুরছ একাকী ;
তোমার দুই-পা হলুদ পাতায় ঢেকে দিয়ে গেছে।
ঢেকে দিল নাকি ইচ্ছেকে আজ বাইরে আসার !
পাতা-ঝরে-পড়া বনের মধ্যে ঘুরছ একাকী।
আমার কথা কি মনেও পড়ে না, কাউকেই আর মনেও পড়ে-না ?

একলা এখন দুহাতে ওড়াও চ্যুত পাতারাশি— পাতার হলুদ
তোমার দুইপা আরো টেনে নিক
আরো টেনে নিক বনের দেবতা।

ফিরে চলো

বন্ধুদের নিভে-যাওয়া মুখে চিতার আগুন ক্রমে গাঢ় হয়ে জ্বলে
বহুদিন স্বপ্নে তারা পারাপার করে দেখি জ্বলন্ত আগুন
আগুনের সীমানায় পুড়ে যায় আমাদের বালক-বেলার লাজুক সময়
জলের ওপর তরতর ভেসে-যাওয়া সাদা হাঁসের মতন
কোনো কোনো সন্ধেবেলা এইসব আলোচনা বুকের ভিতর-
অসম্ভব বাতাস কষ্টের সৃষ্টি করে আজো।
সন্ধেবেলা বুকের ভিতরে টেলিফোন আমাকে বলেছে
'ফিরে চল পিছনের দিকে, শস্য-ভরা উঠোনে দাঁড়াও
নম্র পাগল মানুষ।'
পাণ্ডুলিপি পুড়ে যায়— বন্ধুকে লিখিত চিঠি পোস্টহীন পড়েছিল
টেবিলের কোণে,
আগুন খেয়েছে তার আধাআধি, বাকীটুকু আমার আলস্য
বিহ্বলতা, কুঁড়েমিয়া যাবে।

এমনকি ভুক্তাবশিষ্ট নিয়ে চলে-আসা-চিঠি কাঁপায় ফুলের লতা
বুকের গোপনে
আগুনের প্রতিভার পাশে উকিল বাড়ির সব হাঁসগুলি
খুব ভয়ে ভয়ে উপস্থিত,
প্যাঁক প্যাঁক শব্দে তারা এইবার চলে যায় যূথবদ্ধ দূরে—
করুণ বিদায়ে ভরা মুখ, লাল ঠোঁট, শেষবার তুলে
সীমান্তের ওপারে গিয়েও তারা দুলিয়েছে অস্পষ্ট রুমাল
ঠাণ্ডা সাদা সিক্ত জলরাশি ;
আমার আলস্য খুব নিরাসক্ত চোখে ওইসব দেখে।

প্রদীপচন্দ্র বসু

হলুদ শবের পাশে

হলুদ শবের পাশে জমে উঠছে হলুদ শব। হলুদ শবের পাশে
জমে উঠছে হলুদ শব,
মানুষের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে গ্রামে ও শহরে।
হলুদ শবের পাশে বসে আছো তুমি,
হলুদ শবের পাশে বসে থাকতে থাকতে
দৃঢ় হয়ে উঠছে তোমার চোয়ালের হাড়,
উজ্জ্বল হয়ে উঠছে দু'চোখ তীক্ষ্ণ এক আলোয়, আর
ধীরে ধীরে সেই আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে
অরণ্য, নদী ও পাহাড়ে
যেভাবে হেমন্তের দিনে রৌদ্রমাখা শস্যের ক্ষেতে
অপরূপ দৃশ্য হয়ে ওঠে।
এত দ্রুত সরে যেতে বিষণ্নতা
এত দ্রুত সরে যেতে বাতাসের নিম্নচাপ
দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছো তুমি,

আকাশে ডিমভাজার মতো ঝুলে আছে চাঁদ
তুমি জানো, সত্ত্ব অথবা প্রণয়ের জন্য না
যুদ্ধের প্রয়োজনে একদিন মানুষের অস্ত্রাগার তৈরী হবে চাঁদে
তুমি জানো, এই পথ, এ প্রয়াস পুরোপুরি সাময়িক
অরণ্য থেকে উড়ে আসা প্রথম শীতের বাতাস খুলে নেবে টুপী—
পাহাড় থেকে উড়ে আসা প্রথম শীতের বাতাস খুলে নেবে টুপী—
নদী থেকে উড়ে আসা প্রথম শীতের বাতাস খুলে নেবে টুপী—
দিনের পর দিন কুঁকড়ে যাচ্ছে আমাদের চামড়া, ফুরিয়ে যাচ্ছে রুটি
হলুদ শবের পাশে জমে উঠছে হলুদ শব। হলুদ শবের পাশে
জমে উঠছে হলুদ শব। হলুদ শবের পাশে
বসে আছো তুমি।

ফুল ও তুমি

কোথায়, কোন বাগানে ফুটেছিল ওই ফুল ?···
তুমি তুলে আনলে এই ভোরবেলায়,
ফুল তুলতে গিয়ে তোমার একটু হাত কাঁপেনি—
তুমি ফুলের প্রেমিক নও, গাছের দিকে তাকিয়ে দেখ
ব্যথায় সবুজ ম্লান হয়ে গেছে।
গাছের জন্যও কষ্ট হয়নি তোমার ?

ফুল দেখলে তোমার লোভ হয়, তুলে আনো
সাজাও ফুলদানিতে···
ও কোন শিল্প ? ও কি লোভ না প্রতিশোধ স্পৃহা ?
তোমার ঘরের মধ্যে সবকিছু অগোছালো
আসবাব, দেয়ালের রং, পর্দা— সব প্রাণহীন
তুমি কোন সুন্দরের পাশে সাজাবে ওই সুন্দর ফুল ?
ফুলের গন্ধে তোমার মনে পড়ে পুরোনো দিনের কথা ?

ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুমি কোথায় হারিয়ে যেতে চাও ?

যাব যেখানে যাবার কথা, যাওয়া হয় না। যে যেখানে
দাঁড়িয়ে এখন, ভুল করে চলে এসেছে সে।
গাছ থেকে তুলে আনলে যে ফুল এই ভোরবেলা—
ফুল তোমাকে কি দেবে ?
এখন সতেজ, গন্ধ ও রংয়ে অপরূপ
একটু পরেই শুকিয়ে যাবে ফুলদানিতে। আর,
ওই ফুলের মতোই জীবন তোমার
দেখে মনে হয় যেন
কেউ তোমাকে স্বর্গের উদ্যান থেকে জোর করে তুলে নিয়ে এসেছে এখানে।
সাজিয়ে রেখেছে কিছু ঈর্ষা দিয়ে, বেঁচে আছ তুমি।

আসলে এই পৃথিবী আমাদের নয়
ফুল আর মানুষের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর প্রজনন-ক্রিয়া বেঁচে আছে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অঘ্রানের শীতরাত্রি কেঁপে ওঠে

বন্দীশালায় জেগে থাকবার মুহূর্তে কেবলই প্রহরীর জুতোর আওয়াজ স্পষ্ট হয়
বাইরে ফিরে যায় দ্রুত বেগে ধাবমান সময় ও পৃথিবী, কোথাও
সারাক্ষণ রাত বারোটার ঢং ঢং শব্দ হয়……রাত বারোটার……
নিভৃত সময় নিয়ে একা একা বসে থাকে নম্র ঝিঙেফুল
পোড়োবাড়ির অন্ধকার নিয়ে এই দিনযাপন, চামচিকের সাথে
অন্ধকার ভাগাভাগি করে দুবেলা ভরানো এই বুকের প্রকোষ্ঠ
বাইরে তাকাতে গেলেই প্রহরীর জুতোর শব্দ শোনা যায়
মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ মচ্

যেন অঘ্রানের শীতরাত্রি কেঁপে ওঠে কালপেঁচার সুতীক্ষ্ণ আওয়াজে
গোখুরার ফোঁস ফোঁস শব্দ জাগে, দুপায়ে মাড়িয়ে যাওয়া
ঘামের লালার ক্ষরণ—
লেগে থাকে চোখের পাতায় হিমঝরা দুর্বার শিশির,

সামুদ্রিক মাছের হাড় জমা হতে থাকে বুকের দুপাশ জুড়ে
বাইরে ফিরে যায় দ্রুত বেগে ধাবমান সময় ও পৃথিবী, সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণে শুধু
ফুটিফাটা ডালিমের রক্তিম দাঁতের মাড়ির হি হি অভ্যর্থনা
যেন চিতার শরীর ঐ কারাগৃহের ডোরাকাটা জামা ও দরজা
ঘুমন্ত যবের ক্ষেত হু-হু হাওয়ার কেঁপে ওঠে শীতের চাদরে
কেউ কোথাও নেই, শুধু নিদ্রাহীন বন্দীশালার সময় মুখর হয়
প্রহরীর জুতোর শব্দে মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ মচ্

তুমি সেই নারী

যে মুহূর্তে জেনে গেলাম তুমিই সেই নারী
বিশ্বাসকে খুন করেছ, রক্তমাখা ছুরি
তোমার নরম হাতের মধ্যে এবং তোমার মনে,
তৎক্ষণাৎ যে ভরিয়ে দিলাম চুম্বনে চুম্বনে ;

ভালোবাসার পাপড়িগুলো তোমার নরম নখে
ছিন্নভিন্ন, বিষছোঁয়ানো ঠোঁটের আমন্ত্রণ
একচক্ষু লাস্যে কাঁপা, আগুন অপর চোখে
জেনেও আমি বুক বাড়িয়ে দিলাম আলিঙ্গন।

শ্যামলকান্তি দাশ

মধ্যরাত

দূর আকাশের অই ফুট্‌টুস তারার মতো একজন
জলদবরণা চলে গেল, তারই সজল অভিমান এসে
ঝাপটা মারলো গায়ে
রেলগাড়ির শব্দে এখন ব্রিজ ঝমঝমাচ্ছে, আর
অই আমার ভেঙে পড়ছে মূল্যবোধ !
চারপাশে মারকুটো গানের বিস্ফার, গুল্মের ঘাড়ে
ছড়িয়ে পড়ছে কাঁচা বিভা. পিঁপড়ে ও
ফুলটুকি পোকার খুদকুঁড়ো, আর ফাঁকা, শূন্য, অবসান
এইসব এঁড়েল মানুষের মতো থমকে আছে
চোখের সামনে
আমি গুড়ি মেরে আছি আর আমার আড়াল
ওদিকে কর্মফলের ওপর মাথা পেতে শুয়ে আছেন

আমার স্ত্রী, এটা ওঁর ন'মাস, ওঁর ঘুমের সামনে
এখন পৃথিবীর বিশালতম স্বপ্ন, স্বেদে জলে শাঁসে
গড়ে উঠছেন একজন দিব্যনীলিমার কবি !
আর এখনই দেখুন কী মজা, ঠেসে ধরেছে আমাকে
পৃথিবীর যত ভয়, একটি করাল নখের কাছে
মানুষ কত খর্ব হতে পারে আমিই তার প্রমাণ !

সময়ের ফাটা আয়না থেকে পারা আর
কাঁচাকুচি এসে বিঁধছে আমার গায়
আর পাহাড়মানুষ ইয়েতি, তার তো ঘণ্টা,
পাহাড়ের হিমসোঁতা থেকে সে
চেটেপুটে খাচ্ছে পাঁপরের মতো ঠুনকো একটা
আবুড়া-খাবুড়া চাঁদ !

ঘুমে স্বপ্নে জেগে থাকা

আমি যেন আসল ঘুমের গাছ, আঠাময় নীল পাতা
তুমি যেন আকন্দের সুশীল কুঁড়িটি, জেগে আছো পাশে
মাঝখানে মন্দিরে যাবার পথ লালচে সরু দিগন্ত অবধি —
আর এক খুলিফাটা ইঁদুরের ঘুরঘুর মরণচঞ্চলতা
জানালায় মেঘ নেমে আসে !

আমাদের শস্যগুলি কর্মের দ্যোতকগুলি ছেলেমেয়েগুলি
ওই ঘরে, পরিত্রাণ হয়ে আছে, স্বপ্নে ঘুমঘোরে—
তারা তো মানুষ নয়, চাঁদে-পাওয়া গোবরের ফুটফুটে পোকাগুলি
মানুষের পুষে রাখা পাখি
ভেসে ভেসে সরযূ নদীর আঁশ, জলে ভেজা ছাগলের নিঝুম ঝুমঝুড়ি !
আমরা এমন দৃশ্য এরকম উন্মোচন ধরে রাখব নাকি ?

চিরনূতনের ছায়া জেগে ওঠে কোশল শহরে।

পাশাপাশি শুয়ে থেকে বুঝতে পারিনি
এখন বাসনা মানে পায়ে পায়ে হেঁটে চোর, আসে আর
চলে যায়, মুক্তির লিখন রাখে ঠোঁটে··· ···
আর ওই চিন্ময় সুন্দরের শান্ত সিঁড়িটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
অতল ধ্বনির কাছে, নরম শস্যের বাঁকে, চাঁদের বাতাসে
স্বপ্নে ঘুমে আমাদের নাড়ির মমতাগুলি ওই ঘরে, ওই তার শিলীভূত সুর

চারটি চোখের আঠা বাজনার মতো বাজে
হেসে ওঠে চারকুড়ি পলাশী কুকুর !

বীতশোক ভট্টাচার্য

এরকম অবজ্ঞা করে না

আমের বউল এনে দেওয়া ছিলো মাঘের দুপুরে ;
মুকুলকে কিশোরীরা কখনোই এরকম অবজ্ঞা করে না·
কোকিল হারিয়ে যায়, অথবা রচিত হয় পত্র-অন্তরাল ;
প্রেম থাকে ; তুমি কে থাকো না জালে, হাতের মুঠোয়
সুগন্ধি লেবুর পাতা, সেফটিপিন, শিশুদের লগ্নের পত্রিকা-
কোথায় মঞ্জরি পাবো রোদ ঝরে গেলে ?

চলকো করে চুল বাঁধা, সাঁওতাল পরগনা বলে মনে হয় ;
দ্বিপ্রহর গান বাঁধে সাঁওতালি ছাতের কার্নিশে ;
দ্বিপ্রহর কামিনেরা কখনোই এরকম অবজ্ঞা করে না :
শরীর উদাস ছিলো বড়ো সাধে দীর্ঘবেলা ···
পরদা ঝুলিয়ে দাবি জোড়া-ছবি ঘরে রেখেছিলে ;

ছুটি পেলে ঘুরে যাবো, অতঃপর চারু কানে শিরীষ রেখো না ;
চতুর্দিকে ঘষামাজা, বড়ো বেশি স্বাস্থ্য মেরামতি ।

তার নাম ভালোবাসা ? দ্বিপ্রহরে যার ঘাটে মুখ ধুয়ে আসো ?
অশোকের রোগা পাতা, ক'আঙুল ঘটের উপরে
জেগেছিলো ঢেউ জল, মুকুল ও পরিণতি, পল্লব···পল্লবই ?
প্রস্তর ঝুঁকেছে ছায়া, নাম ছিলো প্রবণতা, ছলনা, দর্পণ
ভেঙে যাও রাজহংসী, জলের শরীর···
ও জল তো বউঝিরা কখনোই এরকম অবজ্ঞা করে না
আমের বউল তবে কেন এনে দেওয়া ছিলো মাঘের দুপুরে ?

স্বপ্নের কুসুমগুলি

স্বপ্নের কুসুমগুলি ঝরে যায় আজ তার চুলের উপরে ;
এমন রঙিন, লঘু, যেন মুহূর্তের আর কিছুই থাকে না
এর বেশি সুখভার, এর বেশি ক্ষণকাল গতানুশোচনা
সে করে নি কোনোদিন, তাই ওই পুষ্পদাম ঝরে যায়, ঝরে

হাওয়ার মঞ্জরিগুলি, কী তাদের শিশুখেলা হাওয়ায়, আকাশে
তার আরো ভালোবাসা, তাই স্তব্ধ হয় গান, চুলের উপরে
থাকে না পাখির বাসা, ছায়া চাপ হয়ে আছে, সিঁথির দুপাশে
ওই কী পাখির ডানা, জানে না কিছুই ওই মঞ্জরিরা, ঝরে ।

অরণি বসু

পাগল

সংসার-পাগল একদিন সমুদ্র-পাগলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে
সমুদ্র-পাগল একদিন শহরে যায় সংসার-পাগলের খোঁজে
দু'জনেই পথে পথে ঘোরে, প্রেমিকের মত ভিখারীর মত—
কেবলই দূরত্ব বেড়ে যায়, কোলাহল বাড়ে আর বাদবাকী পাগলেরা
কেউ কেউ নখ খোঁটে, কেউ প্রেম করে, কেউ বা সেয়ানা বেশী—
কাব্য করে বসে।

বেলা গড়িয়ে এলে আনমনা বধূটিও ভাবে 'পাগলামি' শব্দের মানে—
অন্ধকার ছুটে যায় আরো ঘোর অন্ধকারে
মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারে রাঙাভাঙা চাঁদ
উড়ন্ত পাখি দেখে, চলন্ত ট্রাম দেখে পাগলেরা হেসে ওঠে
উন্মাদ হাসি আর
অনেক, অনেকদিন পরে দু'জনের দেখা হলে,
দু'জনেই ক্ষীণতনু, ম্লান হাসাহাসি হয়।

সংসার-পাগল ফের ফিরে যায় শহরের পথে
সমুদ্র-পাগল ফেরে (কোথায় আবার ?) সমুদ্রতীরে।

সুন্দরদির বন্ধু

বিজ্ঞাপনের মত প্রেম, পোস্টার আর নিয়ন সাইন, এই শেষ নয়
আছে ট্রাম ও বাস, অফিস-কাছারী, তাদের
পেটের ভেতরের লোকজন, হই-চই আর
অজস্র ম্যাজিক, এই সব নিয়ে কলকাতা
কলকাতার গভীর অন্ধকারে ছিলো আর একজন,
সে সুন্দরদির বন্ধু।

দীর্ঘজীবন ধ'রে সে খুঁজে বেড়িয়েছে পথ ঘাট,
তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছিলো সিঁড়ির সুষমা, যা দিয়ে ওপরে ওঠা যায়
তার জন্য কোন মঞ্চ ছিলো না, ফুল ছিলো না,
অভ্যর্থনা ছিলো না
সব ডুবে গেছে ভৎর্সনায়, বন্যায়, বেদনায়—

এই শেষ নয়, অভিমান যত হোক ভারী,
যতই চোখের জলে ভেসে যাক চাঁদ
আরো দীর্ঘদিন তাকে কাটাতে হবে এই কলকাতায়—
ব্যর্থতায়, অপমানে—

দুঃখে ও শোকে কুঁজো হ'তে হ'তে
সে যুবক একদিন খুব রোগা হয়ে যাবে,
তখনো ভিড়ের মধ্যে থেকে ছেঁকে, সেই কৃশ শরীরের দিকে চেয়ে
কেউ কেউ হঠাৎই বলে উঠবে, 'ওই যে ওই আমাদের
সুন্দরদির বন্ধু'।

অজয় সেন

করতলে আগুন, খ্যাখো নিভে না যায়

(শ্রদ্ধেয় সরোজ দত্তকে মনে রেখে)

এতদিন কূট রহস্যে ভরা ছিল এই বাঘবন্দী খেলা, ভরা ছিল তোদের
ক্রূর, অবিশ্বাসী চালচলন, ওঁত পেতে বসা
কখন খেলা শেষ হবে ;
কাকে তোরা ফেলে এসেছিস আলোহীন, নিস্তব্ধ ভেজা সড়কে ?
ঐ মানুষ একদিন ফিরে আসবে, মানুষের কপালে হাত রাখবে
আলো অন্ধকারময় মানুষের মগজের ভেতরে তাঁর খোলা ঋজু
প্রবন্ধের ওড়াউড়ি ঘূর্ণি ঝড়ের মতো উড়ে বেড়ায়— আজ।
গম্ভীর বিষণ্ণতা আগে ভাবাতো আমাকে— কি ভাবে এগোবো
কিভাবে সাপের ধূর্ততায় মোকাবিলা করবো ঐ বিকট ষড়যন্ত্রের সাথে,
আহা, এই দুঃখিত মৃত্যু আমাকে উত্তরাধিকারী করেছে
সর্তক করে বুঝিয়েছে— এ বড় কঠিন সময়।
এবার এই শেষ দশকে উন্মত্ত কলরোলে, আহ্লদী ঢংয়ে ধান উঠবে
চাষীর ঘরে
এবার এই শেষ হেমন্তে উন্মত্ত হুঙ্কারে এগিয়ে যাবে সশস্ত্র মিছিলে
এই চাষীরাই— আর ঐ নশ্বর মুখ
দূর থেকে হাসিমুখে দেখে নেবে শত্রু খতমের মহান উৎসব এবং
ঐ দূর থেকেই আপনি দেখে নিন— কিভাবে আমরা লালকালিতে
গোটা অক্ষরে লিখে নিচ্ছি আততায়ীর নাম, ঠিকানা ও মুখোশের মাপ ;

কি ছিল তাঁর অপরাধ? কোন দোষে তাঁর এই অন্তিম প্রহসন ?
সমস্ত লোকালয়, গ্রাম্য মেলা, বালিয়াড়ি থুম স্তম্ভিত থাকে শেষ অপরাহ্ণে
এই জান্তব, ঘৃণিত হত্যায়—
কালো সন্ত্রাস বুকে নিয়ে বাংলাদেশ— আর তার প্রত্যয়ী ছেলেরা
দ্রুত শিখে নিচ্ছে বদলার ভঙ্গি
দুই হাতের করতল ঘেরা সাবধানী আগুন— খ্যাখো নিভে না যায় ॥

কবি

গভীর রাতে একাকী কবির কাছে উঠে আসে করুণ ভিখিরী বিষণ্ণতা
লজ্জায় মুখে 'রা' কাড়ে না— বলে— আজও পারলাম না তোমায়
ছেড়ে যেতে
কবি বুঝি অন্তর্নিহিত গাঢ় ঘুমের কাছে নতজানু আশ্রয়প্রার্থী হয় শেষে।
কবির সম্বন্ধে নানা কথা রটে কলকাতার বাতাসে
সাজানো, গৃহস্থপ্রিয় কবির হাহাকার, নিঃশব্দ কান্না শোনেনি রটনাকারীরা
শুধু মাত্র কালো অক্ষর লব্ধ জ্ঞান তাদের মগজে খেলে সারাদিন
অথচ ঐ তারা জানলো না, কত রাতে কবি একাকী ঘুরেছে এ শহরে
নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে অভুক্ত, কতদিন এড়িয়ে থেকেছে ক্ষুধা এবং নারী ;
আজ কবি লিখেছে পদ্য— কিভাবে পায়ের তলার মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে
দূরে — আরো দূরে
কখন চোখের থেকে সরে যাবে পরিচিত দৃশ্যাবলী ও সময়ের কথা
যা শুধুই রক্তক্ষরণের,
ভ্রূক্ষেপহীন কবি উনসত্তরের গোড়ায় শুনিয়েছে
শহরের হিমজড়ানো ঘুমিয়ে থাকা দীর্ঘ সেতুর গল্প
যার দুই প্রান্ত ঝুলে আছে অনন্ত নিস্পৃহতায় আর
যুদ্ধসাজ ঘরের প্রতি।
কবি তাই বেঁচে থাকে একান্ত অস্ফুটে
যার কিনা রেখে যাবার মত কিছুই নেই শেষবেলায়
কেবলমাত্র কবির হাতের যুদ্ধ ঘরের দিকে নির্দেশিত আঙুল
ও প্রিয় তেজী কলম— যা কিনা
রাইফেলের চেয়েও ভয়ংকর ॥

নিশীথ ভড়

ফুলের মতো সহজ

আমার বাবার অসুখ করলে মা যান মন্দিরে
তাঁর চোখের তারায় তারায় কাঁপতে থাকা ভয়

সর্বাঙ্গে মেখে স্নান করেন পুরোহিত, আর সুদূর দেবতা
ধূপধুনোর ধোঁয়ায় নাচতে নাচতে নাচতে নাচতে
ভেঙে পড়েন শব্দে, ঘণ্টার শব্দে

বাগানের সব ফুল নত হয়ে আরোগ্যের অনুমতি দেয় আর

বাবার অসুখ সারলে মা ফের অসুখে পড়বেন

পথ

ভালোবাসা যেতে পারে শান্ত ড্রমাইল শাদা পথ
পথ শব্দটির কোনো বিকল্প ছিল না তাই বিপত্তি ঘটেছে
আজো সংসারের মধ্যে : সারাপথ খুব চুপচাপ
কে যে শুয়েছিল, তাকে ভালোবাসা উপেক্ষা করেছে।

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

জাদুকরের ঘুঁটি উল্টিয়ে দেয়

হাজারো রংমশাল আর ফুলঝুরিতে
দেওয়ালী শুরু হয়ে যায়
হঠাৎ প্রদীপের তলানি তেলটুকুও শেষ
কোথায় দামামা বাজে ঘোর গম্ভীর নিনাদে
কে যেন যুদ্ধজয় করে ফিরে আসে
রাজপথ ভিড়ে ভিড়াক্কার
চকিতে প্রত্যেকটি মুখ শব বাহকের
দরজায় প্রেমিকের পরিচিত হাত
দরজা হাট করে খুলে বেরিয়ে আসি
ঘাতকের তরবারি আমাকে নিঃস্ব করে দেবে
বলে শাসায়।
আমি দ্যূতপণে পরাজিত যুধিষ্ঠিরের ন্যায়
আত্মরক্ষার্থে অজ্ঞাতবাস মেনে নিই
বিদঘুটে কাণ্ডকারখানা বাধাতে ওস্তাদ জাদুকরেরা
আনাচে কানাচে
মুহূর্তে ঘুঁটি উল্টিয়ে বিপর্যয় বাধিয়ে দেয়।
আমার কুড়িয়ে বাড়িয়ে যোগাড় করা সব সুখ
মুহূর্তে মুহূর্তে দুঃখ হয়ে যায়।

জাদুকরের ডুগডুগি

মাটিতে আকাশে রোদ্দুরে বাতাসে
বাজে জাদুকরের ডুগডুগি
এক একটা মানুষ হঠাৎ ভোল পাল্টে
শেকড়ে বাকড়ে পাতায় কাণ্ডে আদিম বৃক্ষ হয়ে যায়
এক একটা মানুষ বিস্ফোরক গভীর খাদ হয়ে যায়
মানুষে মানুষে বিশাল জটিল গাছপালায় ছয়লাপ
আঃ কি ঘন জঙ্গল, কি গভীর খাদ
আর কিছু খেলা নেই !
প্রান্তরে জ্যোৎস্না নামে. কঠিন জ্যোৎস্না
ধারালো ফলার মত মানুষের বুক চিরে মাথা চিরে
টেনে টেনে বার করে বীজধান
মাটিতে পুঁতে ফেললে
পলকে তাজা সবুজ লকলকে চারাগাছ হয়ে যায়
এ গাছে ফুল ফুটবে ?   ফল ফলবে ?
নাকি এ শুধু খেলার গাছ ?   ম্যাজিকের গাছ ?
মাটিতে আকাশে রোদ্দুরে বাতাসে
বাজে জাদুকরের ডুগডুগি
মানুষেরা হাসে কাঁদে কাজকর্ম করে
হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়
ঘন জঙ্গল গভীর খাদ
হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়
তাজা সবুজ লকলকে চারাগাছ

কমল চক্রবর্তী

ডুখার মায়ের বুকে

একদিন বিয়ান বেলা আর উঠব না
কম্পানীর চুলা দাউ দাউ
পো পো বাঁশী সব ঠিক ঠাক
শুধু আমি নাই

ডুখার মায়ের বুকে
আঘনের বিলাতী বাগানে ঠায় পড়ে
মহুল ফুলের মত দশ আঙুল
সব কাড়ে, এমন কি সাধের জীবন
রথের মেলায় কেনা সেনো-পাউডার
অড়হরের তাগড়া বাগান

এত সুখ ডুখায় মায়ের বুকে
এমন গরম
যেন শিরীষ গাছের নীচে
বহুদিন

বহুদিন পৃথিবী দেখিনি
কোথায় হুটার বাজে
আগুন উস্কে দিয়ে মজদুর মেঝেতে হাঁপায়
গনগন গেরুয়া ধুঁয়োর ছাঁটে
কালিমাটি রোড ডুবে যায়

অ্যাপ্রোন দস্তানা খুলে কখন শুয়েছি
এই অড়হরের ক্ষেতে মনে নাই
আর উঠা হবে না এবার
যতই হুলিল হোক বড়বাবু কেটে দিক নাম
ডুখার মায়ের বুকে এই শেষ আমি হে শুলাম
এই শেষ আর উঠা হবে না এবার

চাইবাসা

ডাক-বাংলোর বদ্ধ বিষণ্ণতায় জেগে উঠলো রোরো
কাননপথের অভিমান
পয়েণ্টস্‌ম্যানের ভাঙা খাট্টা মুখ, মনে পড়ে গেল
কবেকার জাল শেওড়াফুলি।
আদর্শ হাওয়ায় বেড়ে টপ্পা গেয়েছিলে, মহাশয়
প্রাতরাশে আণ্ডাভাজা, সিঙাড়া পোকড়ি, মনে পড়ে ?
ভয়ংকর শব্দে বাজে সাড়ে নটা, বিবিধ ভারতী।

এ ভুখা কাননপথে, রবীন্দ্রসঙ্গীত জমে না
কালোর চায়ে কি কিছু কম চিনি ছিল ?
রঘুর দোকানে এসো। হাত গরম ত্রি-কোণ চাইবাসা।
আঁচলের ঝরণা খুলে দাঁড়ালো যুবতী, ভিস্তিওয়ালা
মাংসের ফোয়ারায় নাচে দেশওয়ালী চাঁদ
বনভোজনে এসো।
ফিরে এসো দুঃখী মানুষের কার্বন কপি।

তবু বিষণ্ণ বাংলোর ছাদে জ্বল্‌লো ডে-লাইট,
জোনাকিরা নয়
আর কত দেবে দেশী মদ
রবীন্দ্রসঙ্গীত বুঝে, হাটগাঁর মেয়েরা দোল দেবে
তা কি হয় ?

ভোজালির মতো ক্ষিদে পেটে, দাঁড়ালো যুবতী
উরুতে চোখের জল
মাংসল ডাঙায় ফুটে
কালো চাইবাসা

সোমক দাস

আন্টির জোড়াকুত্তা আন্টির পুডিং

আন্টির বাথরুমে পেচ্ছাপ করতে গিয়ে ভয় হয়, শব্দ হবে নাকি !

চার দেয়ালেই আয়না ছিল নির্ভুল হাড় মানে যৌনতা, একরাশ চুল
আন্টি কি ওইখানে খুলে রাখে স্নানের পোশাক
গাত্রমর্দনে এরকম বিপুল পুলক ইত্যাদি আন্টি কি জানে

ডাইনিং টেবিলে থাকে আন্টির পুডিং, রঙ দেখে আমি চমকে যাই
এতো পুরুষের নিঃস্ব ও একাকী মুহূর্তের রঙ

আন্টির জোড়কুত্তা দীর্ঘযুগ ধরে ডাকে বিছানায় কিংবা ঘোররাতে

খবরের কাগজ খুলে বিজ্ঞাপনে খুব ঝুঁকে আন্টির চতুর উদ্যম
'দেখেছিস ?— হাতা ফ্রি, হেণ্ডালিয়ম'

এ কেমন আত্মভুক তুমি, আন্টি— ছেলেকে জড়িয়ে ঢুকে যাও নিপাট বিছানায়
তোমার শরীরে থাকে হায়নার চোখ থাকে সর্পজিহ্বা তুমি তার
কিছুই জানো না।

এ কেমন তুহিন শীতল ঘরদোর মেঝে ও দেয়াল
কঠিন তুষার তুমি ছড়িয়ে রেখেছো শরীরে ও সংসারে, সিঁড়ি থেকে
বাথরুমের দিকে

বাদুড়পৃথিবীর গল্প

রাত্রির দেবদারু বৃক্ষে রাত্রির স্থাপত্যের মত ঝুলে আছে বাদুড়
এই দৃশ্যের কাছে এসে, বালকবয়সে, সে ভুলেছে
তার ঘরে ছিল দু-একটি নিরীহ মথ ও অনেক ভুল প্রজাপতি
যাদের ভয় ও আদর তাকে টেনে এনেছে পথে।

পথের রাত্রি তাকে ঝুলন্ত বাদুড়পৃথিবীর দিকে নিয়ে যায়
তারপর সে দেখেছে তার চারপাশের মানুষেরা কিভাবে ঝুলে আছে
কত বিষণ্ণ তাদের মুখচোখ, তারা
দেবদারুবৃক্ষটি খুঁজে নিতে কতখানি নির্মমনির্ভুল।

অন্ধকার পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে আসে সুখী ভোরবেলা
এইরকম জোর হলে সে খুব অসহায় হয়ে যায় মনে মনে।

ঘরের স্বরূপ সে আগেই জেনেছে বলে
সে এখন বলা যায় পথেরই মানুষ, পথ তাকে বিমুখ করে না
পথের কার্পণ্য নেই, গোপনতাবোধ নেই— সে খুব সহজে
এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়, এক পথ থেকে অন্য পথে।

পথের স্বভাবে সব সঞ্চয় সে অর্থহীন বলে জানে, তাই তার
ঝুলে থাকার মত আজো কোনো দেবদারু বৃক্ষ নেই।

তুষার চৌধুরী

পুনরপি চতুর্দশপদী

সজনে গাছে ছ্যাখা দিল কাকের ডিমের মত নিষ্কলঙ্ক চাঁদ
পেচ্ছাপের আদাহ্ন চেটে নেয় নভশ্চর নেশাখোর হাওয়া
রাগেশ্বরী ক্যাওলা ভূত নিয়ে কাছাকাছি একটা উদ্ভট বিবাদ
বেঁধে গেছে এমনি রাত যেন মুখোমুখি হয়ে অরণ্য পুলিশ আর তুখোড় ডাকোয়া

সজনে গাছে ছ্যাখা দিল ডিম্বাকার তুঁতে নীল ম্রিয়মাণ চাঁদ
এই দৃশ্যকল্পে আমি জুড়ে দিই উত্তেজক মেশিন সংগীত
উত্তেজনা থেকে একটা ধাতুর মিথুনমূর্তি পড়ে ভাঙে ও গড়িয়ে যায়
নৈঃশব্দ্যকে সে সময় মনে হয় জেলিমাখা দীর্ঘ যোনিখাদ

কুকুরের প্লুতকণ্ঠে বোনের কান্নার মত বোবা ইতিহাস
ইতিহাসে নরনারী কামত শনির কৃপা জুপিটার জুনো
মানুষের চেয়ে বেশী প্রজনন শক্তিধর মাথার উকুনও
মানুষ জেনেছে শুধু নোংরা নখ ব্যবহার আঙুলের ত্মাস

ফুল পাপড়ি জলে ভাসে যদি নোংরা নখ কেন ধোয় না শিশিরে
এই তথ্যভিত্তি থেকে ইতিহাস ধারাগুলি বিশ্লিষ্ট হয়েছে বলে মনে হতে পারে

প্রাপ্তবয়স্কের কান্না

আজকে নিজেকে কেন খুব অভিমানী মনে হলো
নিজের কাছেই
চোখে দু একটা জলের বিন্দু চিকচিক করেছে এসময়
মৃত্যুর পেয়াদা এসে হানা ছায় বার বার হানা দিক
হৃৎপিণ্ডে যকৃতে মূত্রাশয়ে
কিছুর দরকার নেই আমি সরাসরি হেঁটে অকুস্থলে পৌছে যেতে পারি
আগে পরে যেমন দরকার
এসব কিছুই নয় কিছুটা ফারাক হবে পরিমাণগত
কিন্তু যা ভাবায়
কিছুদিন বেঁচে থাকতে উৎসাহিত করে
সে এক কেউটের ক্রোধ
লেজে যে পা রেখেছে আমার তার
কপালে কি চুমু খাব দাঁত বসিয়ে, ঢেলে দেব অতি নীল বিষ ?

ক্রোধ ভালো কিন্তু এই দুচোখের জলের চিকচিক
এর তাৎপর্য কী ?
ক্রুদ্ধ হও ক্ষতি নেই তবু এই জলের টলটল
অসহায়তা কি ?
মরে' যাওয়া স্বাভাবিক এক হাবা সম্রাটের খাজাঞ্চি খানায়
সালতামামির সাথে জমা পড়ে যাব
অথচ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় খাজাঞ্চির পোঁদে
কষে একটা লাথি ঝেড়ে যদি একটু বর্ধিত সময় পাওয়া যায়
তবে কিছু লাভ
কিন্তু সে সুযোগ কেউ কোনো শালা ছায় না এরকম এক অবিশ্বাস থেকে
কান্না আসে
প্রাপ্তবয়স্কের কান্না শুকোলে সে নুন
সমুদ্রের বলে মনে হয়

ধূর্জটি চন্দ

ঐ কপালে টিপ হলো না

অনেকটা দিন পরে যখন তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম
তোমার সঙ্গে কেউ ছিল না, প্রাণ ছিল না রাগ ছিল না ;
কেবল তুমি তরঙ্গহীন বাড়িয়ে দিলে বেতের চেয়ার
চা না কফি বলেই সেই যে ভেতর গেলে আর এলে না।

এলো তোমার স্বতাপ নিয়ে পোর্সিলিনের তুমুল হর্ষ,
আড়াল থেকে কেউ কি তবে নাড়িয়েছিল রুমালগুচ্ছ ?
দীর্ঘকালের পোষা বুবুন, ঘুমের পাশে শান্ত মিঁয়াও,
তাকেও তুমি পাঠিয়ে দিলে আতিথেয়তায় ফাঁক ছিল না।

অনেকটা দিন পরে যখন তোমার কথা পড়লো মনে
হাতে রইল শান্ত মিঁয়াও, বেতের চেয়ার, উষ্ণ তরল ;
এই যে-টুকু সুখের ছবি, ভাঙা আর্শী যত্নে রাখা
এবংবিধ সুখের শাণিত ঐ কপালে টিপ হলো না।

ব্যবহৃত, হৃত

নিভৃতে সকল রম্য, আত্মসুখে একাকী নির্ভর
র'চি স্মৃতিপুষ্পগুলি, মালা গাঁথি, সহসা যে ছেঁড়ে
ভূমিকম্প হয় বুঝি তখনই ঠিক বুকের ভিতর
কোথাও আঘাত ছিলো, কষ্ট ছিলো, তাই প্রতিরোধ

ছত্রছান করে ফেলি পুষ্পগুলি নখের আঁচড়ে
নিদারুণ মেঘ এসে কথা বলে ঘন বরষার—
ছড়ানো কুসুম হাসে, সেই শব্দে তীব্র হলাহলে
জেগে ওঠে পুনর্বার দিনগুলি, একদা যৌবন।

নিভৃতে সকল রম্য, একা একা তাই লক্ষ্য করি
আমার রচিত দিন পুষ্পহীন ও গন্ধবিহীন
মালা হতে খ'সে পড়া ফেলে আসা চাতালে শুকায়
যেন ঠিক বেলিফুল, ব্যবহৃত, হৃত।

মলয় সিংহ

বিভাজন দিন যায়

বৃক্ষ থেকে ফল ঝরে যায়

আমিও শিখেছি আজ অনায়াস ছেদ, বিভাজন
অহর্নিশ ফুল ফোটে, কোমল মৃদু গন্ধ নিয়ে
হৃদয়ের পাঁকে— তাকে বলে জনম ও জীবন ।

এক জনম জীবন, জনম জীবন দুই, তিন,
এইভাবে দিন কাটে, মাস এবং বছর । তারপর ?

দিন যায় দিন যায় দিন কি যায় না ?
কেউ আসে কেউ আসে কেউ বা আসে না,
ভেঙে যায় ভেঙে যায় কেউ বা ভাঙে না
ফুল ফোটে ফুল ফোটে ফুল তো ফোটে না !

এক জনম জীবন, জনম জীবন দুই, তিন,
এভাবেই একদিন বিভাজন শেখে ।

বৃক্ষ থেকে ফল ঝরে যায়,
ঐহিক নিয়মে কাটে দিন, দিন যায় ।

ভালোবাসিস

থাকিস ভালো, অন্ধকারে একলা বসে থাকিস
একটুখানি আড়াল কোরে আমায় ভালোবাসিস।
থাকিস ভালো, বাসিস ভালো
ছোট্ট ঝিনুক হৃদয় নিয়ে লক্ষ জ্বেলে রাখিস।

ঢাকিস আমায় একলা ঢেকে রাখিস,
যেমন কোরে মেঘলা আকাশ চাঁদকে ঢেকে রাখে
ঢাকিস ভালো, থাকিস ভালো
দুঃখ খানিক জলের নিচে জলকে ছেঁচে ফেলিস।

গাছ-গাছালি মন মাতালি তালুতে ভুঁই পাতিস,
শুশুনি তুই, শাককে ফেলে শুশুক হ'য়ে থাকিস
ডুবিস ভালো, খেলিস ভালো
গাছের মতো শেকড় নিয়ে হাতটি ধরে রাখিস।

একটুখানি আড়াল কোরে আমায় ভালোবাসিস ॥

মৃদুল দাশগুপ্ত

২০৭০-এর তরুণ কবিকে

সে এক রাত্রির কথা ; ভাবো, টানা শূন্য মাঠ, আর
আর ঠিক তোমার পিছনে, মাটি ফুঁড়ে অশরীরী
লম্ফ হাতে খুব দূরে ছুটে গিয়ে, হাজার মশাল হঠাৎ জ্বালিয়ে
হঠাৎ-ই নিভিয়ে দিলো, এক ফুঁ-য়ে ; আর তারপরেই গুম্ গুম্
বুক ঠুকছে গোরিলারা, চাঁদও দিচ্ছে নীল আলো, যে রকম দেয় ;
চারিদিক ফাঁকা, ধু-ধু, আর থেকে থেকে ঠাণ্ডা হু-হু, মাঝখানে
পড়ে গেছো তুমি ;
তারপর শব্দ করে হঠাৎই গজালো গাছ, সুন্দরী গরান,
এক···দুই···একলক্ষ···
আর জল, ঘোলা, নোনা, দক্ষিণবঙ্গের স্রোত চটকা ভেঙে দিগ্বিদিকে ক্ষ্যাপা
সঙ্গে সঙ্গে ঝুমঝুম নূপুর বাজিয়ে এলো থামশুদ্ধ 'ইন্দ্রাণী মহল'
ভাবো, ভাবো, শূন্য আকাশ থেকে লোহার শিকল বেয়ে
সবুজ হলুদ লাল, খুব, ছোট্ট, মোমবাতি, শেষ রাত্রি, আর
তোমার মাথায় দুলছে ঐ সে শিকল বাঁধা স্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠন ;
এবং আকাশ থেকে যখন নামালে চোখ, চারিদিকে 'তওবা' তওবা'
কেউ গালে চুমু খাচ্ছে, কেউ করতলে,
—ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিতে 'ভীষণ দুঃখিত' বলে হাওয়া এলো কি অব্দি, আর
তুমি বললে 'যাবো না তোদের সঙ্গে, তারারা তো এতোদিনে বুড়ি হয়েছেন'
তৎক্ষণাৎ কাঁটাঝোপ টপকে যাচ্ছে একসঙ্গে তিন হাজার নীল জেব্রা—
জেব্রাগুলি চলে যেতে চাঁদের আলোয় বালি, স্ফিংস শুদ্ধু উঁচু পিরামিড,
মুহূর্তে তোমার পেলো প্রস্রাব ও জলতৃষ্ণা, একসঙ্গে, আর
দেখলে লণ্ঠন জ্বলছে গলুয়ের মধ্যখানে, নৌকো দূরে সরে সরে যায়
—এইতো পুরোনো নদী, তুমি ভাবলে 'এখানেই তো গতবার পিকনিকে এসে
কি নাম সে মেয়েটির, ছোট্ট মতো, টেনে খুব— খুব ইয়ার্কি করেছি'
ভাবতেই টুপটাপ, শিশিরেরা, আর শাদা, শাদা দাঁত, খুব চেনা হাসি,
—'অতসী, অতসী, বাহ্' মনে পড়তে শব্দহীন বাঁক নিলো ছোট্ট নদী

আর তারপর, পাথরেরা নিজেরাই নিজেদের জড়ো করে
ছোট্ট পাহাড়, টিলা, উঁচুনিচু স্তূপ ;
এছাড়াও গাছে গাছে অনেক জোনাকি, ঝিঁঝি ডাকছে গূঢ় সাংকেতিক
এরই মধ্যে তুমি দেখলে এক হাতে ঝাউগাছ, অন্যহাতে সবুজ লণ্ঠন নিয়ে
পরীহুরী উড়ে গেলো একদল, আকাশকে চিরে,
চলে যেতে ফের সেই ফাঁকা মাঠ, তুমি দেখলে তুমিও হয়েছো পার বহুপথ, আর
এখনো অনেক বাকি, ভাবতেই ঠাণ্ডা হাওয়া, কালো চাঁদ, হিম,
মাটি ফুঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে কাছে এলো রোগামতো হঠাৎ কে যেন,
—ও চোখ তো চেনা চেনা, ঐ নাক, শতাব্দী আগের গন্ধ হাসির পোশাকে···
সেই লোক তোমাকেই ডাকনাম ধরে ডাকলো, আর
অপ্রতিভভাবে বললো, 'ডেকেছো আমাকে ?'

চতুর্দশপদী

পৃথিবী গৃহের পাশে সবুজ তারার মতো সহজ, উজ্জ্বল
হঠাৎ এসেছো ভেসে সহসা অনেক দূর চলে যাবে বলে
পড়েছে নীলাভ আলো অন্ধকার জলে, যদি ঢেউ-য়ে প্রাণ পাই !
মাছের শ্বাসের লঘু বুদ্‌বুদ হয়ে ক্ষণপ্রাণবিন্দুগুলি
মুহূর্তজীবনগুলি আবার জড়িয়ে থাকে জলজ পাতায় !
সন্ন্যাসী কাঁকড়া যদি দোল খাই ঝিনুক-কংকালে, ভাঙা কণ্ঠে
সাগর কুসুম হয়ে বেঁচে থাকি । তিমির ফোয়ারা হই ! পাখি !
অথবা বালির দেশে তৃণের মৃদুল দেহে জাগি ছোট্ট শীষ !
সামান্য পাথর যদি সৌর-নিয়ম ভাঙি, যদি শরীরের
সমস্ত শৃঙ্খল ছিঁড়ে আলিঙ্গনে ধ্বংস হই, ধ্বংস হতে চাই !

চক্রের নিয়মে ঘুরে অযুত বছর পরে ফের এসে যদি
রহস্য মেঘের মধ্যে ঈষৎ রক্তের চিহ্ন, অস্তসূর্য দেখে
এদেশ হয়তো চেনা, যেন আগে বেড়াতে এসেছে মনে হলে
আমাকে আবার ভাবো, সে ছিলো উজ্জ্বল শ্যাম, মীনরাশি, আর·

নির্মল হালদার

টাকা

আমি শুধু টপাটপ্ খেয়ে ফেলবো টাকা, টাকার ভিতর আমি
গন্ধ পেয়েছি, টাকার ভিতর মাংস পোলাও-এর সুগন্ধ খেলেই মহার্ঘ আমি,
মহোদয়।
মহোদয় বৃত্তি হ'য়ে লোকের ভাতে ধুলো ছড়াবো, ধুলো খেয়ে ওরাই আবার
ধুলো পা ধুইয়ে দেবে, মুছিয়ে দেবে পা ভিজে গামছায়। আমি হোহো ক'রে
হেসে উঠবো
হাসতে হাসতে আমি কেঁদে উঠবো, কাঁদতে কাঁদতে আমি আরও হেসে উঠবো
হাসতে হাসতে টাকা জড়াবো
টাকায় টাকায় পূজনীয় আমি, ওরা আমার পায়ের ছাপ বুকে নিয়ে
বহন করবে
টাকার ভিতর টাকা চেটে তুলবো।

এলোমেলো জীবন যাপন

আমি কখনও কল্পনা করি না আমার কাঁধে বসছে প্রজাপতি
আমি শুধু কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আছি
আমি কখনও কল্পনা করি া।
আমি তবে বন্ধুদের বলি : চিরুনি কেন
হাওয়া এসে চুলে বিলি কেটে যাবে। আয়নাই বা কেন
আমরা মুখ দেখব জলে। জুতোই বা কেন
আমি তো চটি জোড়া ভাসিয়েছি কাঁসাই-এর জলে
ধুলো পায়ে ঢুকবো ঘরে, ধুলোর 'পরেই ব'সে পড়ে
চিঠি লিখব : আমার ওষ্ঠে মধু তাহার ওষ্ঠে মধু
আমি মধু-মঙ্গল হ'য়ে আছি।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

বুঝতে পারছি

দুঃখ হরণের সঙ্গে বহুকাল দেখা হয়নি

কোন ছোটবেলায় ছিঁড়ে নিয়েছিলো
রঙিন পুতুলের সঙ্গে মায়ের মুখ
তারপর দীর্ঘকাল ডুব—

হঠাৎ সেদিন এক হাতে রক্তগোলাপ নিয়ে চলতি ট্রামে
কেমন আছো? বলেই লাফিয়ে উঠে পড়লো
বুকে টনটন করে উঠলো একটা অবশ ব্যথা
বুঝতে পারছি, ওর মনে পড়েছে আমাকে
ওর নাম দুঃখহরণ, প্রেম—

চলে যাবার আগে একটু গোছগাছ করে নিতে হবে,
আমায় একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে দাও

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী

হাঁটু পর্যন্ত যায়নি চুল কাজল কালো মেয়ের
হাসলে টোল পড়ে না, গজদাঁত যায় না দেখা
চোখ নামিয়ে কথা বলে স্বভাব লাজুক
আনমনে ঠোঁট কামড়ানো— তার মুদ্রাদোষ
উচ্চতা দেখিনি মেপে, শুধু জানি
সোজা দাঁড়ালে আমার বুকের মধ্যে মুখ
ভাঙা বাড়ির বারান্দায় বছরের সাতশো দিনই
তার দেখা পাই স্বপ্নে, দেখি জাগরণে

এই হলো পৃথিবীর সেরা সুন্দরীর বর্ণনা
কারণ তাকে এরকমই দেখতে।

জয় গোস্বামী

জন্মপত্র

আবার অর্ধেক মুখ, ছিন্নভিন্ন, পড়েছে বাঁ পাশে
দর্পণে, স্খলিত আরো, অংশত ঝলসানো দগ্ধ হাড়
গাল থেকে বেরিয়েছে, একটু রক্তাভ-সাদা···হার
দাঁতে চেপেছিল বুঝি? চিবুকে ওষ্ঠের আশেপাশে
সোনার গলিত রং, বিন্দু বিন্দু, পিপাসিত, খল···

অথচ সে দিন রাত্রে যখন আরক্ত ঘন মদে
ভ'রে দিলে ওর মুখ একা একা সবার অমতে,
আর, ধীরে ধীরে ওকে ঘিরে নিলো সিঁদুর, শৃঙ্খল
তখনই করুণ টিপ কেঁপে গেছে আশঙ্কায় আরো:

'কি ভালো তিনতলা ফ্ল্যাট, তাও খুব একা লাগে, আর ও
এত দেরি করে রোজ।' সঙ্গে সঙ্গে 'জন্মপত্র কই'
বলেই স্ফুলিঙ্গ এসে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ
দর্পণে, অর্ধেক মুখ মুছে দিয়ে···

আজ তুমি জানো
মুকুরে বাকিটা মুখ পড়ে আছে দগ্ধ, ঝলসানো !

একটি প্রেমের দৃশ্য

যতদূর মনে পড়ে একটি অশ্ব
তার মাটিতে ঠেকে যাওয়া পাকস্থলী
তার নাসার বিস্ফারিত ছিদ্র
তার আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ঘাড়
যতদূর মনে পড়ে তার বাদুড় শরীর
তার ধারালো সুন্দর ওষ্ঠ
ও অবশেষে, মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসা
মাঝখান দিয়ে কাটা জিভ
যতদূর মনে পড়ে একটি কচ্ছপ
আর বিরাট বর্তুল
পিঠ
যার উপর থেকে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে অশ্বটিকে আঁকড়ে ধরেছে
তীব্র আঙুলে সেই বাঙালী মেয়েটি···

সৈকত রক্ষিত

ভালো মানুষ

ভালো মানুষেরা কম খান, কম বাহ্যে করেন, কম কথা বলেন
ভালো মানুষেরা শুধু ভালো মানুষের সঙ্গে থাকেন
রাত্রে স্বপ্নের ভেতর স্রেফ ভালো মানুষের স্বপ্ন দেখেন
স্বপ্ন দেখেন আবলুশ কাঠের পালঙ্কে শুয়ে আছেন ভালো মানুষ
তাঁর গায়ে ভালো মানুষের পরিচ্ছদ. আসনে শয়ন ভঙ্গিমায়
ভালো মানুষের প্রকৃতি আর মৈত্রীর নীরবতা

ভালো মানুষের স্বপ্নে ভালো মানুষেরা ভালো মানুষের জাগরণ
টের পান
ভালো মানুষের দুর্দিনে ভালো মানুষেরা ভালো মানুষের
পাশাপাশি এসে দাঁড়ান—
ভালো কথা বলেন, ভালো পরামর্শ দেন, ভালো কামনা করেন
আর
ভালো মানুষের দুঃখে ভালো মানুষ কাঁদেন
ভালো মানুষের সুখে ভালো মানুষ হাসেন
ভালো মানুষের মৃত্যুতে ভালো মানুষ শোক প্রকাশ করেন
তাঁদের নিয়ে কাগজে কাগজে……

আমরা ভালো মানুষ হ'লে, আমাদের মৃত্যুতেও
ভালো মানুষেরা পদ্য-টদ্য লিখতেন !

এই কোলকাতা

এই কোলকাতা, প্রতিদিন বিখ্যাত হওয়ার জন্য বসে আছে
তাই পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে পাথর
পাথর ভাঙতে ভাঙতে ধুলো !
এই কোলকাতা, প্রতিদিন অস্থিরতার জন্য ব'সে আছে
তাই মানুষ দৌড়ুতে দৌড়ুতে বাতাস
বাতাস দৌড়ুতে দৌড়ুতে শূন্যতা !
এই কোলকাতা, প্রতিদিন ভালোবাসার জন্য ব'সে আছে
তাই ভালোবাসা বাড়তে বাড়তে গাছ
গাছ বাড়তে বাড়তে আকাশ !

অল্পদিনে, কোলকাতার বাবুরা, কোলকাতার বুকে
সেই ডানা জুড়ে দিতে চান—
যার নাম খ্যাতি
যার নাম ভালোবাসা
যার নাম কর্ম-কোলাহল !

গৌতম চৌধুরী

গৌতমের প্রার্থনা

আমাকে এখনো কেন রেখেছো অটুট, ভেঙে ফ্যালো হে বিপন্ন গভীর শূন্যতা
তোমার হিংস্রতা নিয়ে কাছে এসো, স্পর্শ করো, জ্বালো, নিরঞ্জন অগ্নিকণা দিয়ে
ঢালো তীব্র হলাহল এই দুটি অনিত্য নয়নে নিভুক সমস্ত ভুল আলো
আত্মপরতামগ্ন আমার তুচ্ছতায় হে আকাশ ব্যাপ্ত করো তোমার আক্রোশ
কত মিথ্যা সান্ত্বনায় স্নেহে প্রেমে ঐশ্বর্যে বিলাসে গত হ'ল আমার যৌবন
পেয়েছি পর্যাপ্ত রত্ন রাজ্যপাট অস্ত্রশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ বন্দীর আর্ত বন্দনা
খেলেছি উদ্যানকুঞ্জে সঙ্গিনীর শরীরের হেমে, পুষ্পসম এসেছে তনয়
ভ্রমণ কোরেছি কত অভিনব দেশ জনপদ, তবু আজ ক্লান্ত আমি একা
বুঝেছি কত না ব্যর্থ মানুষের এইসব অভিমান যুদ্ধজয় প্রণয় অসূয়া
কত হীন রাজনীতি কি নিরর্থ মন্ত্র উচ্চারণ যাগযজ্ঞ ঈশ্বরকামনা
ক্ষমাহীন মৃত্যু এসে একদিন মুছে দেবে সব, তবে কেন এ আত্মছলনা
বারবার কোলে এসে পড়ে সেই শৈশবের হাঁস তীরবিদ্ধ শিল্পের মতন
যেন বলে : তুমি পরাজিত। তাহ'লে আমাকে আজ লয় করো অনন্ত বসুধা
নাহ'লে অমৃত দাও, পূর্ণ করো নিরুপাধি ন্যগ্রোধের মত উজ্জ্বল বোধিতে

ভিলানেল

পাহাড় চুড়োর পথ একরকমের সমতটও
অন্তরকম অহঙ্কারের মণ্ডলে মিল আনে
একটি অর্ধবৃত্তরেখায় নীলিমা তার পতন

ছড়িয়ে ছায় বিশাল মুঠোয় অনন্ত সংগঠন
সেই গরিমার রোদ পড়েছে পুবমুখো খিলানে
এই ঘুমন্ত যক্ষপুরীর পার হ'য়ে সিং-ফটক

সময় হ'ল তেপান্তরে বেরিয়ে পড়া—— টো টো
আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ে এক আরক্ত ভিলানেল
সাজিয়ে তোলা, অনেক দূরের স্বপ্নে মৃদু ব-ঠোর
যুক্তি তর্কে যেমন জ্বলে ওঠা ঋত্বিক ঘটক

শান্তি সিংহ

পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় সন্ধ্যা

খোয়া-ছড়ানো ফার্মের পথে য়ুক্যালিপ্‌টাস্‌, সিলভারফার্ন আর গ্লাইসিরি-ডিয়ার উজ্জল শরীর ছুঁয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেছলাম…

সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক-মাঠ আর ঢেউজাগা শিলীভূত নীলসাগরের দেশে ইতস্তত লাল-কাঁকুরে মাটির ছোঁয়া দু' পাশে পুটুসের জঙ্গল : গোলাপী-সাদা, হলদে-লাল গুচ্ছ-গুচ্ছ ছোটফুল নাকছাবির মহার্ঘ শিল্প-সৌন্দর্যে বন আলো করে আছে। সেগুনমঞ্জরী বিশাল সতেজ পাতার ঊর্ধ্বে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সরল অথচ বিরল আয়োজন করেছে। ইকেবানার কি এর সঙ্গে তুলনা চলে? হাল্‌কা-গোলাপী শিরিষের রেশমীকোমল ফুলের মাঝে ক্রৌঞ্চমিথুনের চঞ্চু বিনিময়, অর্জুন-সেগুন-শিশু-পলাশের মাথায় চঞ্চল বনটিয়ের ঝাঁক, বনকাঞ্চনের ঝোপে নিঃসঙ্গ টিট্টিভের কাতরতা, ফিঙের ধূর্ত ওড়াওড়ি, আর ধান বা ভুট্টার যোজন-ব্যাপ্ত মাঠের আলপথে সিকয়াল-মখমলি ঘাস মাড়িয়ে বর্ষার লাবণ্যজাগা যূথবদ্ধা দেহাতী যুবতী ঝুমুর কিংবা ভাদুগানের মোহময়ী স্বর—তারই মাঝে সোনালি-কমলা রঙের সন্ধ্যা আমাদের বেগ্‌নী রঙ মাখিয়ে দ্রুত অতিক্রুত তরল অন্ধকারে গ্রাস করে নিল।

বিস্তীর্ণ ছোটনাগপুরের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সাগরের বুকে দু'টি সাদা ফেনবিন্দুর মতো আমরা ক্রমশ নিজেদের অস্তিত্ব মুছে তরঙ্গায়িত বিশাল কালো ব্যাপ্তির জঠরে হারিয়ে গেলাম।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে

রাজোয়ার রমণীর কালো নিটোল স্তনের মতো
মেঘের স্বপ্ন নিয়ে
আতপতপ্ত ছোটনাগপুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে
বুকে তার শূন্যতার তীব্র অগ্নিজ্বালা
কখন শ্যামাঙ্গী মেঘ সুখস্পর্শ দেবে
এই ভেবে নব যক্ষ অযোধ্যা পাহাড়ে মাথা রেখে
বিরহকাতর হয় আষাঢ়ের প্রথম দিবসে।

সমরেন্দ্র দাস

ওঁ পদ্ম

মন্দিরে বাজল ঘণ্টা, তুমি বসলে আসনে ওঁ পদ্ম
মেঘ ডাকল গুমগুম শব্দে, আকাশে বিদ্যুৎ ঝলক
যে নারী জানালার পাশে ছিল, কেঁপে উঠল তার বাম স্তন।
চক্ষু পলকহীন দূরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত
সে কী চায় তীব্র ঝম্‌ঝম্‌ ঐ বিদ্যুৎ-তাড়িত জল!
ধ্যানীর ধ্যান, ভাঙাতে সাহস পায় না কেউ
এদিকে আলো যায় নিভে, অন্ধকার— ঘোর অমা
বাতাসে জলের ঘ্রাণ, শ্বাসবন্ধ যৌন উত্তেজনা
ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, সে চায় আশ্রয়…
পর্বতের শিখরে মন্দির, শূন্য ঘর— ওঁ পদ্ম
সময় হল, কোথায় যেন যাওয়ার সময় হল
বাজ পড়ল, চতুর্দিক কম্পমান, কে টান টান ডেকে উঠল : মা

ধর্মশালার ধর্ম

আদিগন্ত উঁচু নীচু মাঠ, পড়ে আছে রুক্ষ টাঁড়— মহাক্ষেত্র
তার ভিতরে টিংলং টিংলং সুরে আমাদের টাঙ্গাও চলেছে
তখন প্রভাত, তখন নীল আকাশ, অতি ধীর মানুষের জাগরণ
তার ভিতরে দোল— দোলে সূর্য, দোলে হাওয়া, আর আমরাও!

তারপর ধর্মশালার দ্বার খোলা— বিশাল লৌহ দরোজা
ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দে আবাহন, হ্যারিকেনের ছটা
'সবই সুন্দর' এই বলে তুমি গান গাইলে ছাদের ওপর
আশ্চর্য ঠাণ্ডা ঘরে ততোধিক আশ্চর্যভাবে খেলা হল শুরু।

প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তুমি নিলে আকণ্ঠ, আমাকেও দিলে
'সবই সুন্দর' প্রতিধ্বনি তুলে নেবালাম আলো, সভ্যতাও
তারপর মহাক্ষেত্রে শয়ন, টাঁড় ভাঙা, ওঠা— ক্ষতবিক্ষত শরীর
ধর্মশালার ধর্ম যদি থাকে, আমরা ছিলাম সেদিন অধার্মিক।

অঞ্জন সেন

সহসা

সহসা অসংখ্য মই নেমে আসে
আমরা চমকে উঠি
আমরা চমকে উঠি গাঢ় রঙ দেখে

সহসা পদ্যের ভেতর শব্দরা হাঁটতে থাকে
আবার ঝিমোয়
সহসা খতিয়ানের ভেতর থেকে উঠতে থাকে টাকা
ক্রুদ্ধ পুলিশ ডান হাত গুটিয়ে নেয়

সহসা ফুটবল, মাঠ থেকে উধাও হয়ে গিয়ে
পড়ে ঈশ্বরের পায়ে
জাম গাছে ঢিল ফলে
আকাশ থেকে মদ পড়তে থাকে
সহসা স্ট্যাচুর মুখ থেকে পেট্রোল বেরতে থাকে

ভেসে ওঠে প্রেতের আঙুল
সহসা…

আহার

শ্যেন পাখির ডানায় সমস্ত আকাশ ঢেকে গেছে,
নিচে
অসংখ্য শকুন মেতেছে আহারে-উৎসবে,
একদল কাক কসাইখানার থেকে
নিয়ে আসে নাড়ি।

ওপরে রুদ্র আছেন, অদৃশ্য
মাঝে মাঝে
চড়ক উৎসবের জিভ ফোঁড়া আর
আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা দেখে যাচ্ছেন,
প্রচণ্ড মন্ত্রে মানুষ হচ্ছে কাক,
যাচ্ছে মাংসের দোকানে।

দেবদাস আচার্য

খিদে

আমার ছোট্ট আর মিষ্টি মা রুটি ভাজেন
এবং তাকিয়ে থাকেন বাবার সেলাইকলের দিকে
এবং আমরা সবাই চুপচাপ বসে থাকি
যেন কোনো একটা বিপদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে

বাণিজ্য সুন্দরীর প্রতি লিরিক

তুমি ঐ ডানলোপিলোর গদিতে শুয়ে কালো ব্রা খুলছো ভাবছো তোমার
যৌন শরীরের কথা
তোমার বেটাছেলে সব সময়ই যার প্রশংসা করে থাকেন, তার সহকর্মীরাও
মাথা নিচু করে ঘন ঘন যার প্রশংসা করে যায়, সাধু ভাষায়, আর তুমি
বাঁকা নাভির বিদ্যুৎ উন্মুক্ত করে শহর পরিক্রমা করো, দরিদ্র শহরটিকে
উজ্জীবিত রাখার জন্যে
এবং তুমি উল্লসিত হও যৌনতা উৎপাদনকারী ও তার ব্যবসায়ে গরম
সভ্যতার প্রতি
তুমি আশীর্বাদ করো ঐ সুখাদ্য ও পানীয় সকলের প্রতি, তুমি মৃদু যত্নে
ডায়াট করো ও পানীয় খাও ছোট্ট পেগে, যা আহরণ করতে ব্যস্ত থাকেন
ভেড়ির মালিক, জোতদার, শেয়ার বাজারের দালালরা কালো ও সাদা টাকায়
মাঠে, বাগিচায়, ফ্যাক্টরির হাড্ডিসার মানুষেরা সব সময়ই তটস্থ হয়ে থাকে
তোমাকে সুখী রাখার কাজে। যাবতীয় শিল্প, সঙ্গীত, পদ্য ও গবেষণাগার
ব্যস্ত থাকে তোমাকে সামান্যতম খুশি রাখার জন্যে। এবং তোমার
অভিজাত যোনী
যা ঈষৎ পৃথুল, গম্ভীর ও গর্বিত, যার বন্দনাগান করে থাকে হাইসোসাইটি
তুমি কিছু হিং উপহার দাও ঐ দেহ থেকে, যার গন্ধে মেতে থাকে
ভূপর্যটক, কবি, চিত্রকর, সুদখোররাও বিনয় শ্রদ্ধা জানায় এবং মদ্যপরাও
টুপি খুলে ঘাসে জিভ ঘষে, পণ্ডিতমশায়রা গাঁজা খান, সন্ন্যাসীরাও

ওম তৎসৎ বলে চতুর্গুণ ধ্যানে মগ্ন হন, এবং

ঐ যোনীসমূহের প্রেরণায় ভারতীয় ব্রিজ নির্মিত হয় ১৪টিন বালি ও ১টিন

সিমেণ্ট মিশিয়ে

আর তুমি গরীব মানুষদের কথাও ভাবো, বস্তি উন্নয়নকল্পে চাঁদা দাও

জেনেটিক্স ও জোতদার পূর্বপুরুষের কথা ভাবো, তাদের ছবি লটকে দাও

মিউনিসিপ্যালিটির গ্যালারীতে

সমস্ত বিদ্বৎসমাজ তোমাকে উইমেন-লিব-এর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে ডাকেন

তোমার বক্তৃতা শুনে এডিটররা বলেন— কেয়াবাৎ, খাপসুরৎ

(আমার স্ত্রীর শাড়ী কিন্তু ছেঁড়াই থেকে যায়)

এবং আমলারা তোমার ফটো তোলেন, সাংবাদিকরা বক্তৃতার কপি নিয়ে

ছুটে যান প্রেসে

তোমার প্রতি জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে শহরের উঠতি মেয়েরা,

আর আমি বেশ জানি, যে

তোমার ঐ অভিজাত যৌনাঙ্গ সকল এবং তোমার স্বামীর অণ্ডকোষ পুষ্ট হয়েছে

আমার বাবার ঘামে, শ্রমে, রক্তে, হতাশায়, দারিদ্র্যে, শোকে, দুঃখে, পরিতাপে

বৃদ্ধ হ্যাজ বাপ আমার, আমি তার কুলির-বাচ্চা-কুলি, অন্য কথা ভাবি

দেবাশিস বসু

কীভাবে জানি না

অনেক শ্বাসের শব্দে নেমে এলো একটি গোধূলি
যে-রকম জন্ম চিরকাল
অনেক জন্মের মধ্যে···অথচ আসলে একটাই -
যে-রকম স্বপ্ন, ঘুম, ঘুমশেষে হিম জাগরণ
যে-রকম ইচ্ছামৃত্যু, বিলাস ও ভোগের মধ্যে বেঁচে
বাঁ গালে দুঃখের ছোটো কালো তিল যত্নে
পুষে রাখা
আয়নায় মুখ দেখা — সুখী মুখ অবশ্য যাদের !

আমার আড়াল নেই একটানা ভ্রমের ভিতরে,
বেঁচে আছি মনে হ'লে ভয়ানক ভুল বোঝা হবে
ভ্রম ও ভ্রমের এই শব্দ দু'টো তবুও সশব্দে
কীভাবে পড়লো ঢুকে মাথার ভেতরে এই
বিকেল ছ'টার রাজপথে··· !

তুমি কবি, বোলতার সমাজে

প্রতিটি শব্দের আছে অতি-ব্যক্তিগত পবিত্রতা
তুমি তার সামনে যাও, অন্ধকারে তুমি তার আরাধনা করো
শুধু এই আলোয় এসো না।

এখন এ-আলো ঘিরে বোলতারা বেজায় ব্যস্ত,
তারা জেনে গেছে সার্থকতা
কুড়িয়ে-কাচিয়ে এনে লবণহ্রদের ফ্ল্যাটে জড়ো
করার কৌশলে,
এবং যদিও খুব সঙ্ঘবদ্ধ তবু তারা নিজেরাই এককেটি দল—
ভ্রম-সংশোধন ক'রে চেয়েছে ভরাতে শূন্য জীবনের সবগুলো পাতা !

তোমাকে চেনে না কেউ, না-চেনাই ভালো, তুমি একা
টেরিটিবাজার ধ'রে কৃষ্ণসাগরের দিকে যাও
বিকেলের দিকে ঐ গোধূলিমন্দির পথ পেয়ে যাবে চমৎকার ফাঁকা
বোলতার বদলে সঙ্গ দিতে পারে মধুমক্ষিকাও।

প্রতিটি শব্দেই আছে অতি-ব্যক্তিগত পরিত্রাণ
তুমি কবি, অন্ধকারে স্পর্শ করো তুমি ঐ শব্দের পশম
শুধু তাকে আলোয় এনো না !

স্বপন চক্রবর্তী

অনন্ত বিষাদ

এই শ্মশানে আমার ভাগাড়ের মাটি আগলে তুমি আর কত
ফোটাবে স্থলপদ্ম।

পদ্মবুক খালি করে ঝরে যাবে মহার্ঘ পরাগ,
তন্ত্র মন্ত্র ভেঙেচুরে তুমি আর কত অনন্ত দেবে আমায়।
ভালবাসি বলে কাছে ছিনু বলে
কতদিন কত রাত ঠেকিয়ে রাখবে আমার শেষ চন্দ্রায়ণ।

আমি আর কতদিন এইসব বিষাদের সঙ্গীসাথী হব,
এই মহাদেশ মহা ব্যোম ব্যাপী দুঃখ বিষাদে দেখে যাব,
বিছানো খাটিয়ায় স্বজনের জরাগ্রস্ত মুখ।

এই শ্মশানে আমার ভাগাড়ের মাটি আগলে তুমি আর কত
ফোটাবে স্থলপদ্ম,
আর কত অনন্ত দেবে আমায়।

আড়াল

মুখের উপর সব সময় আমার ঝুলে আছে অমায়িক হাসি,
সেখানে জমকালো প্রাচীন বারান্দার দীর্ঘশ্বাস
যেন খুব দুঃখী একা একজন মানুষ
তার গায়ে তোরঙ্গের গন্ধমাখা দলা মোচড়া শার্ট।
অইখান থেকে আমি কোনদিন জয়ের স্বপ্ন দেখিনা. খুব ভয় পাই।
বন্ধু করুণার কাছে মাথা নিচু করে পাশাপাশি হাঁটি,
অসহ্য অপমান বোধেও তর্জনী তুলতে ভুলে যাই।

আড়ালে আমি ঠিক এই রকম নই ;
সেখানে সাবেকী বাড়ির ঐতিহ্য.
কয়েক সপ্তাহ পর দাড়ি কাটা আস্ত উজ্জ্বল একখানা মুখ ;
যতটা তার নমুনা তার থেকেও তার বনিয়াদি আরও প্রাচীন
যেন আমার মাস্টার আমি, আমার পায়ে লাগানো আছে আন[illegible] নাল
অইখান থেকে আমি সমস্ত ব্যর্থতা জয়ের স্বপ্ন দেখি,
অপমানে ক্ষোভে আহত পশুর মত রুখে দাঁড়াই, আনি ভাঙচুর।

মুখোমুখি আমি বিনীত, সামাজিক, একা একজন ;
আড়ালে বেঁচে থাকার জন্য বাঘের ক্ষিপ্রতায় ঘোরাফেরা করি।

অনিল মাহাতো

আহ্বান

কুল্হি মুড়ার খাপ্‌রা ঘরটায় হামদের বঁঠে বাবু
পিতলের চাভিখাড়ি চরে নিয়ে গেল্‌ছে
যদি কবু ইংল্যান্ডে আসিস মামাবি তখন
হামরা কদ কুট্যে লেটো খাই সগনজ্জব
হামিই বাপের বড় বিটি বঠি
ঘরের সোব কামগিলান
হামার ঘাড়েই চাপা।
হামার বাপে ইদিন কুছুই করতে লারে
অদের ঘরের বড় বাবু বলো গেলছে
ঋনটা মেটাঁয় দিতে হবে।

বাপ ইদিন দমে কুড়ি হঁয়েছে বাবু
বিকে বিকে জমিগিলান সোব ফুরাঁয় দিল
হাম্‌রাত পাঁচ বহিন বঠি —
হামি ইদিন কয্যে বড় হঁয়েছি বাবু
উপর কুল্হি ঘুরতে যাতও লারি
বিটিছেল্যার মিছাই জনম বাবু
পরের ঘরকেই আলা করে
ঠাহর করে আসবি বাবু
কুল্হি মুড়ার খাপ্‌রা ঘরটা বঠে।

মাঝি পাড়ায়

মাদল বাজে মাদল বাজে
ঢুপকু ঢুপুং তাং ঢুপুং
মাঝি পাড়ায় ঝগড়ুডিহে
নাচ্‌ছে দমে সাঁওতালীরা
ঝাঁপে তালে ঝাঁপে তালে

টেঁসফুল ওই মাথায় গোঁজা
সাজলো ভীষণ পাহাড়তলী
ডুংরিবাটে বাজলো বাঁশী
মাঝি পাড়ায় ঝগড়ুডিহে

সকাল থেকেই আজকে মেলা
বেল্‌ডিহের মারাং টাঁড়ে
কাড়াখুঁটা গরুখুঁটা
কি মজাদার বাঁদনা পরব

সকাল থেকেই বাজছে মাদল
মহুল মদে মাতাল মাতাল
তাঁহারেতো নানা নানা
গানের সুরে ঢেউ খেলে যায়

পাগ্‌ড়ী বাঁধা ছোক্‌রা মাঝি
মাদল বাজায় কায়দা করে
নাচ্‌ছে কষে সাঁওতালীর
বুড়ী ঠেড়ি সব যুবতী
উজাড় করে ফুর্তি বিলায়
পাঁতা ধরে নাচ্‌ছে দমে
মাঝিরা সব ঝগড়ুডিহে।

অনন্য রায়

প্রতিকৃতি

মাথায় ফেল্টের টুপি, হাতে ছিপ, ব'সে আছি সামুদ্রিক মাছের আশায়
কখন নড়বে ফ্যাৎনা, অতর্কিতে শুধু হাত না নড়লেই হ'লো
মাথায় ফেল্টের টুপি, ব'সে আছি বাথরুমে ছিপ ফেলে শুকনো চৌবাচ্চায়
বুদ্ধের মতন জ্ঞানী, তত্ত্বভুক দার্শনিক, যদিও বয়েস মাত্র ষোলো !

সেফ্‌টিপিন, ভাঙা সিঁড়ি, অস্তিবাদী প্রগাঢ় দর্শন
এইখানে প'ড়ে আছে চৌবাচ্চায় ঘিলু আদমের
কে তুমি বজ্জাত ! ভীরু ! অ্যানার্কিস্ট ! বিবেক-দংশন
যেন চকোলেট, ক্রীম, কোকা-কোলা, সৌগন্ধ কাফের ।

মাথায় ফেল্টের টুপি, তত্ত্বভুক্ ট্যাণ্টালাস, দীর্ঘ ছিপ হাতে
বসে আছি সুগম্ভীর সমস্ত চিন্তাকে মেটাফিজিক্সে জড়াতে
বুদ্ধের মতন জ্ঞানী, যদিও বয়েস ষোলো, (হা আমার ফেট,
কী আশ্চর্য, ঈশ্বরী যে পিকাসোর বাঁদরের মুখ ও বনেট !)

নৈঃশব্দ্য

দিগন্তের সবুজ চাঁদ নিচু হ'য়ে চুমু খেলো
ধানক্ষেতের অবলুপ্ত ঠোঁটে,
গম্বুজের সৌগন্ধ নিয়ে ব'য়ে চলে নদী
ঝরাপাতার অবিরাম শব্দে নিজেকে আচ্ছন্ন ক'রে ;

সিদ্ধমসৃণ স্বপ্নের দাঁতগুলো ক্রমশ তামাটে হয়।
আমার করতল থেকে জন্ম নিয়ে প্রজাপতি এবং ছাই
সেই বিশাল হাঁ-মুখে, অজানার গর্তে লুকিয়ে যায়
অন্ধকারে— স্তব্ধতার অবয়বে।

জলপাই অরণ্যের প্রগাঢ় স্তব্ধতা,
একটা লম্বাটে ভাঙা মদের বোতল ও নিঃসঙ্গ গীটার,
কিছু নরখাদক নথিপত্র এবং ইস্পাত
সহসা ঝোড়ো-হাওয়ায় কেঁপে উঠলো পপ্‌লার বনে
যখন জ্যামিতিক আয়নার চারপাশে
একঝাঁক পায়রা গ্যালো আচ্ছন্ন মেঘের মতো উড়ে।

ঘুমোও, ঈডিপাস, ঘুমোও, কেন না রাত্রি বড়ো দীর্ঘস্থায়ী—
যতক্ষণ না তোমার ঘুম কমলালেবুর মতো হ'য়ে যায়
এবং কবরের ঘাসের মতো তোমার স্বপ্নগুলো চাঁদের সঙ্গে একাকার হ'য়ে যায়
এবং তোমার ঠোঁটের ওপর শ্যাওলা জমে
তুমি ঘুমোও, অবগুণ্ঠিত বিস্মৃতির মতো,
যেখান দিয়ে টিউবরেল চ'লে গ্যাছে সুগঠিত ইলেকট্রনের দিকে
আর পরিদৃশ্যমান তোমার ব্রোঞ্জের ওভারকোট
শ্বেতপাথরের খিলানের মতো তোমাকে ক'রে দিক দীর্ঘ গোলাকার।

হাওয়া এখন তার পিচ্ছিল সবুজ আর্দ্র স্মৃতিচারণায় মুড়ে রাখবে আমাকে
আর মুহূর্তের পর মুহূর্ত— অনন্তকাল
অরেঞ্জ কার্পেটের ওপর প'ড়ে থাকবে মৃত্যুভক্ষ্য আধখানা রক্তিম আপেল।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

সুভাষের নীল-জ্যাকেট

সারা শীত নালাক্ষ্যাপার মতো শহরময় ঘুরে বেড়ায়
        সুভাষের কমদামি ডেনিমের নীল-জ্যাকেট।
শেষ বিকেলের রোদ ধর্মতলায় দাঁড়িয়ে
আল্‌পিনের মাথার মতো জেগে ওঠে ব্যক্তিগত অস্তিত্বহীনতা।
আর ঠিক তখনই
        মানুষের পদচিহ্নহীন হিমালয়ের বারান্দায়
পুরনো পাইনের লেপার্ড-বাকল জড়িয়ে নেমে আসে
            প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার,
        স্পিডে বেড়ে যায় নীল-জ্যাকেটের টেম্পেরেচার।
তরাই-এর কৃষক রমণীর জানুসন্ধি থেকে তিন ফোঁটা রক্ত
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে নেমে গেলে ডাক্তারের উইলি জিপ্‌
কাকেলাড-মোনাকোর সমানে ছিট্‌কে ওঠে জ্যাকেটের স্টিফ-কলার।

রাত বারোটার গড়িয়াহাটায় যশোদা-ভবনের বারোয়ারি বারান্দায়
সিফিলিস-স্নেহে মুখ গোঁজে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নাগরিক।
ট্রাম লাইনে অ্যালয়ের টুং টাং শব্দ হলে
ইন্‌পেরিয়াল উঠোন শোয়াশুয়ি চালায়.
        বিষণ্ণ শাঁখা সিঁদুর, লালপেড়ে গরদের কাপড়।
রামপুরী আর ওয়াগন ব্রেকিং এর গন্ধে
বোবা কান্নায় হেসে ওঠে গঞ্জের বেশ্যা ও চোলাই।

শেষ বাস থেকে নেমে এলে কম দামি নীল-জ্যাকেট
হাঁটাপথে হেমাগ্লোবিন অন্ধকারে দাঁতে দাঁত শব্দ করে
জেলের ভেতরে ও বাইরে পিটিয়ে মারা
কয়েক হাজার তরুণের জালশালুর মতো চোখ।

নীল-জ্যাকেটের কলারের পেছনে তরাই-এর অন্ধকার

পকেটে ভুলঅঙ্কের তাবৎ হিসেব নিকেশ
শুধু বুকের বোতামে ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে
পলাশীর একজোড়া স্প্যানিয়েল-আকাশ।
যেখানেই অন্ধকার
নালাক্ষ্যাপার মতো সুভাষের নীল-জ্যাকেট সেখানেই আছে

ঈশ্বর তোমার পাপ

ঈশ্বর আমাকে নিয়ে অনেক খেলেছো,
সহজে তোমায় আমি ছাড়বো ভেবো না।
কর্পোরেশনের সাঁড়াশির সামনে দেশী কুকুরের দৌড়ের মতো
তোমাকে ছোটাবো আমি বস্তি ও শ্মশানে।
শুধু কবিতা লিখি তাই
সেই কিশোরীর কৌতুকের অসামান্য হাসি,
অভিমানে স্ফুরিত অধর
ফ্রাই করে সাজিয়ে দিয়েছো তুমি শব্দের টেবিলে ;
শুধু কবিতা লিখি তাই
ভিখিরির সামনে তুমি আত্মসাৎ করেছো আধুলি।
জনাকয় কবিতার বন্ধু ছাড়া
সবাইকে বিদ্রূপে হাসতে তুমি শিখিয়ে দিয়েছো।
শুধু কবিতা লিখি তাই
রক্ত ও ঘিলুর সামনে রেখে
চালান করেছো বিষণ্ণ চোখের ক'ফোঁটা জল।
ঈশ্বর গুরু, কি খেলা খেলছো, মাইরি
পেলেকেও লজ্জা দিয়ে করে যাচ্ছো দমাদ্দম গোল।
অনেক সুখের বুকে আমূল ছোরা বিঁধিয়ে দুঃখ উঠে দাঁড়ালে
লেখা যায় বড় জোর কয়েকটি কবিতা।
শুধু কবিতার জন্য তুমি ক্ষমা পেয়ে গেলেও
ঈশ্বর তোমার পাপ তোমাকেই পাপিষ্ঠ করেছে।

মৃণাল বসুচৌধুরী

আমি

তুমি বললে আলো
সে বললে সময়
তারা বলল পথ
ওরা বলল ঢেউ
আমি যে কি বলেছিলাম মনে পড়ে না।
কেউ আনলে চিহ্ন
কেউ আনলে গন্ধ
কেউ আনল বৃষ্টি
কেউ আনল ...
আমি যে কি এনেছিলাম মনে পড়ে না।
তুমি চাইলে শেষ
তারা চাইল শুরু
তুমি খুঁজলে বৃত্ত
তারা খুঁজল ...
আমি যে কি খুঁজেছিলাম মনে পড়ে না।

গুহাচিত্র

বর্ণহীন

অশ্লীল মুখোশ ছিঁড়ে

অকৃপণ মৌলিক প্রতিমা

উন্মোচনে

দুর্লভ সিঁদুর

রাঙাটীকা

অভিষিক্ত জানু ও আঙুলের শীর্ণ

উত্তরাধিকার

নিরুচ্চার

সীমানাবদল নিয়ে

তর্কাতীত শেষ কিছু ছবি

তৃণাসনে

মোহমুক্ত ক্রুদ্ধ বাইসন

অভিজ্ঞান

অকালবর্ষণে নষ্ট উষ্ণ ছলাকলা

গুহাচিত্রে

শীর্ণতোয়া নদী

সেতু

পুনর্জন্মলোভী এক বিষণ্ণ হরিণ

বিনোদ বেরা

আমাদের কৃষি ক্ষেত

আমাদের কৃষি ক্ষেত বারোয়ারী প্রচেষ্টায় নড়ে উঠবার
প্রতীক্ষায় দিন যাপে, আমাদের সংঘ ও শক্তির
অবিলম্বে উদ্বোধন ঘটানো দরকার,
দৃপ্ত দিগচক্রময় ঘোরা ফেরা হাওয়ার স্বাধীন
খেলাচ্ছলে ছিন্নপাতা কুসুম ওড়ানো—
ভেসে যায় নক্ষত্র সমাজ চন্দ্র সমাজের বারান্দা উঠোন
ছিন্নমরা ফুলে—শুক্র গন্ধে ; গাঢ় পরিক্রমাময়
আমাদের সম্মিলিত জাগরণ এবার দরকার।

হলুদ বিকেল ভরে বাবলার বকুলের পাপড়ি ঝরানো
প্রয়োজন, তোমাকেও প্রয়োজন আছে
হে সূর্য নক্ষত্রে গড়া প্রেমিকা, প্রেয়সী, প্রিয়তমা।
আমাদের কৃষি কবে বারোয়ারী ক্ষমতায় কর্মক্ষম হবে ?
আমরা অমর দুধ হৃদয়ে ধারণ করে কবে
জেগে উঠবো ব্যক্তিগত যৌথ ক্ষমতায় ?
আমরা আবার ফের কৃষিকর্মে আন্তরিক হবো
হে সূর্য নক্ষত্রে গড়া প্রেমিকা, প্রেয়সী, প্রিয়তমা।

সামনে আমার সাত বিঘে ধান

সামনে আমার সাত বিঘে ধান জমির জাজিম রয়েছে পাতা।
শ্রমের সফল পুরস্কার ওই ঢেউ খেলানো অথৈ আমন,
সংবৎসর খরচপত্র সাধ আহ্লাদ নাচন কুদন
এই ফসলের বিক্রি বাটায়—ছচল বছল ঘর সংসার।

থোড়ের মুখে ঝড় বৃষ্টি হয় নি, তবু ভাবনা কি শেষ—
রয়েছে কতো আপদ বিপদ—হায় আচমকা কতো সনে
পাকা ধানে মই দিয়ে যায় পোকা মাকড় বন্যা মারী,
তাই আশঙ্কা আশায় যুগপৎ কম্পিত হে।

গড় পড়তা বিঘেয় যদি তেরো চোদ্দ হয় তাহলে
ধার দেনা শোধ, হালের গরু, খাল নালা সব ভরাট হবে ;
মেঘে রৌদ্রে রোমাঞ্চিত রক্তে তুলে শিরশিরানি
আধেক আঁধার আধেক আলোর মুঠোয় আমার সাত বিঘে ধান।

আশার আকুল আঁচ লেগে কি সবুজ গাঢ় স্বর্ণ হবে !
ধাঁধিয়ে দেবে নয়ন ও মন প্রত্যাশা কে ছাড়িয়ে গিয়ে !
আধেক আঁধার আধেক আলোর মুঠোয় আমার সাধ আহ্লাদ হে·
সামনে সতেজ সাত বিঘে ধান জমির জাজিম রয়েছে পাতা
শ্রমের সফল পুরস্কার ওই ঢেউ খেলানো অথৈ আমন··· ।

কোলাহলে

তোমাদের কোলাহলে আমার নির্জনবাস
অন্ধকার অশরীরী এই কথা বলে

আলো চলে গেলে আলোগুলি নিভে গেলে
সারাৎসারে এসো
এখানে প্রবাহে এসো মগ্নতায় এসো

দিকসারি অর্জুনগাছেরা সমবেত
সমবেত অসংকোচ নিঃশব্দের ধ্বনি
অনেকে আসবে আরো
আরো যারা গাঢ় মেখে নিতে আছে বাকি

তোমরা সবাই অতীতের কথা বলো
এখন সময় দৃঢ়মূলে চোখ রাখো
এইবার শুরু হবে সাম্পানের খেলা
নিমীলিত চোখ মেলে রাখো
চরাচর ভেসে যায় অনবদ্য মগ্নতায় শোনো

তোমাদের কোলাহলে আমার নির্জনবাস
অন্ধকার এমন মুক্তির কথা বলে

কবিতা

কবিতাকে হাতড়াই মাথার ভিতর
চুল ছিঁড়ি দাড়ি ওপড়াই
ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি ঘুমের ভিতর

অথচ জঞ্জাল জমে পাশাপাশি নগ্ন ঢেকে সুন্দরীর ভিড়
এক পা তোলা কুকুর আড়চোখে গ্যাখে
একটি যুবতী নিয়ে রিক্সা চেপে ভদ্রলোক কোনদিকে গেল
বাসের দলাপাকানো ভিড় থেকে চিড়ে হয়ে নেমে
মেয়েটা ঘুড়ির মত উড়ে গেল সোজা
ছেলেগুলো উরু চাপড়ে হাসল বাঁকা শিরদাঁড়া
এবং সারাদিন রাস্তার ওপর হাসি আলো পোশাকের নিচে
বিনিময় ব্যস্ততার প্রবাহ আড়াল করে খেলা করে চলে
অসংখ্য পায়ের জোড়া নিজেরা নিজেরা

বৃথাই কবিতা খুঁজি বুকের ভেতর
রাতের বেলায় নখের কাছেই অন্ধ মাছি ঘোরাফেরা করে
শব্দহীন অন্ধকার জেগে থাকে মাঠে মাঠে রাস্তায় রাস্তায়
মাঠের হাওয়া কেড়ে নেয় ভিড় বৃত্ত অন্তহীন
কপোতীর চোখ থেকে জল ঝরে গেছে৷

কেন যে কবিতা দিই শব্দের ভেতরে
কোলাহলে চুপচাপ বোবা হয়ে থাকে

বরুণ চৌধুরী

অসহায় নীলপদ্ম

হে নদী হে বৃক্ষ কার কাছে আমি
আমার গোপন কথা বলবো। অন্ধকার
রাত্রির স্তনে হাত দিয়ে মনে হয়
এ-স্তনে সেই মুখরতা নেই যাকে
আমি চিনতাম। সোলার ফুল
আর কাগজের নৌকা নিয়ে সে নদী
হারিয়ে গেছে কতদিন আগে।
আমি শুধু এখনও বটবৃক্ষের অভ্যাসে
ফল গড়ি। ফিরে যেতে চাই সেই বুড়োর কাছে
দোকানে যার বাতির লাইন কাটা গেছে
লণ্ঠনে বসন্ত নেই—শরৎও আসে না।
যৌবনের কলকণ্ঠ ডুবে গেছে কচুরিপানায়
'থাক হাওয়া, চলে যাও—এ-মুখো হয়ো না'।
হে নদী হে বৃক্ষ কার কাছে আমি
আমার গোপন কথা বলবো। একদিন
যে নারীর ওষ্ঠ থেকে গান শুষে নিয়ে
মনে হয়েছিল যেন একটি চুম্বনে
ইতিহাস স্তব্ধ হতে পারে, নদী
তার পাড় ভেঙে ছুটে যেতে পারে, মরু
পারে ভুলে যেতে বালুময় ব্যর্থ প্রবঞ্চনা
কলকাতা হতে পারে জনহীন সবুজ তরাই—
আজ যে কোথাও নেই
তাকেই সহস্রবার খুঁজে খুঁজে ফেরা
সূর্যাস্তের সোনাগাছি হাঁটুজলে
জাহাজ ডোবায়। পোষমানা বৃদ্ধ কুকুরের
ভবিষ্যযুক্ত দন্তভরা ছায়া
বার বার ঘুরে আসে। বুকেতে লুকায়
অসহায় নীলপদ্ম।

ঘরে ফেরা

ধীরে ধীরে সেই ফুলে-ঢাকা মৃতদেহটা
অপসারিত হ'লো।
অপসারিত হ'লো সূর্য থেকে
বিরাট আকাশের নীলিমা থেকে
সর্বভূতের বায়ুমণ্ডল থেকে।
ফিরে এসো
ভূলোকে
মাটিতে
সেই চেনা ঘরে
কাঁথাঘেরা মায়ের সংসারী শীতে
মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়ালো
বোবা পঙ্গু পিতার চৌকাঠে
থামলো
কারণ
যে জিভটা সে বাবার মুখ থেকে উপড়ে নিয়েছিল
তা ফেরত দিতে,—
বাবা আবার কথা বলবেন।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

কেউ কেউ স্বাভাবিক নয়
বয়েস আর স্রোতের আড়ালে
কোন সহজ দ্বীপ জেগে থাকে
হাওয়া থাকে রোদ থাকে পাখি গান গায়
পাখির অফিস নেই বাড়ি নেই রাত নেই
মাঝরাতে ট্যাক্সি পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নেই
ঘড়ি নেই এরোপ্লেন নেই
পাখি প্রবন্ধ লেখে না
কিন্তু এসব কোন বিষয় নয়

সেই রাজবাড়ি সাজানো বাগান
শ্যাওলাধরা উলঙ্গ রমণী
সেতুগুলো ভেঙে গেছে
পূর্তমন্ত্রী অত্যন্ত তৎপর
কিন্তু এসব তাঁর বিষয় নয়

যেখানে পাখিও ওড়ে না
সময় শুধু সময়ের বিরুদ্ধতা
কথায় কথায় গড়ে ওঠে
রাজবাড়ি বাগান মন্দির মন্দিরের কারুকাজ
কিভাবে সমস্ত কিছু গড়ে ওঠে ভেঙে যায়
আবার ভাঙার জন্যে গড়া শুরু হয়
এসবই সহজে ঘটে তবু এসব কোন বিষয় নয়
যা দিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়

নতুন কবিতার দিকে

এ আমার বেঁচে থাকা নয়
এ আমার জেগে থাকা নয়
শিল্প নয় বাণিজ্য নয় কবিতা নয়
সমস্ত পায়ের ছাপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে
চলে যায় নতুন পা
কেমন করে ব্যাখ্যা করবে
শুরু করবে শেষ করবে এই প্রবন্ধ

প্রকৃতিকে দেখ
মেয়েটা হেঁটে যাচ্ছে একা
কী সবুজ নিতম্ব
সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে সারা গায়ে
পিছনে নীল শহর
কত কি সাজিয়ে নিয়ে ঝাপসা নীল একা
মেয়েটা হেঁটে যাচ্ছে
পুরনো পায়ের ছাপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে একা একা
নতুন শহরের দিকে
নতুন শহরের দিকে

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেরা

একদিন না একদিন ফিরে আসব
ভেবে, সে বেরিয়ে যায়।
বৃষ্টির ঝাট লেগে ধুয়ে যাবে ব'লে,
যাবার আগে
উত্তরের দেয়াল জুড়ে তালপাতা টাঙায়.
আটচালা ঘরের চালে
অজন্মার বিশীর্ণ খড়ের আঁটি
যত্ন ক'রে গোঁজে।

কুলুঙ্গিতে গৃহদেবতার নিরন্ন মুখে
অমঙ্গলের ছাপ,
দেয়ালে পুরুষানুক্রমে বিবর্ণ
স্বস্তিক চিহ্ন।
উঠোনের বাঁধান তুলসীতলায়
একবার থমকে দাঁড়ায়,
সদর দরজায় ঠাকুমার আমলের
ভারী তালা ঝুলিয়ে
খানিকক্ষণ কী যেন ভাবে···

একদিন না একদিন
কেউ না কেউ ফিরে আসবে
কেউ না কেউ
শ্মশানের রাস্তা ধ'রে বাঁধানো সড়কে এসে ওঠে

শব্দ

নিরীহ বইয়ের মধ্যে
মারাত্মক শব্দ শুয়ে থাকে,
ভূতে পাওয়া বালিকার গল্প থেকে
উঠে আসে
ব্যক্তিগত গল্পের কাঠামো,
খড় ও দড়িতে
আঙুলের গোল কৌতূহল
আঙুলেরই জিজ্ঞাসা ও জেদ ;
সন্তরণ ভেদ ক'রে মাথা তোলে
নিমজ্জিত সিঁড়ি,
বর্ণনার অশ্বপৃষ্ঠ সওয়ার উল্টিয়ে
দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য
অন্ধকারে তীব্র ছুটে যায়

দাউদ হায়দার

জ্যোৎস্না রাতে, জ্যোৎস্নার ভিতরে

জ্যোৎস্নারাতে, জ্যোৎস্নার ভিতরে তুমি শুয়ে আছো—
লাবণ্য ঝরিছে অপরূপ ; এরকম চন্দ্রের ক্রন্দন দেখেছে বাংলাদেশ।
মানুষের ভিতরে এক চাঁদরানী আছেন, অতিব্যক্তিগত
নাচায় তারে আমৃত্যু-শোণিতে-জোয়ারে ; সুস্থচিত্রকল্প, রোমাঞ্চ!

তোমার ভিতরে এক তৃষ্ণা ছিলেন, অন্ধকারের মতো কুটিল
জটিলা নদীর মতো বহুব্রীহি, সার্থক ; সেখানে দীক্ষা নেয়
জলের প্রাণীরা, গভীরতা কতদূর জানে না মাছরাঙা—
শ্মশানে পুড়ছে কাঠ, কেউ পোড়ে অস্থিমাংসসহ।

আমার ভিতরে এক বেদনা আছেন, নারীদের মতো স্বভাবচরিত্র
একবার লজ্জাহীনা হলে কুরে খায় কবিতা, সূর্যোদয়—
তুমি জানো স্বর্ণমুদ্রা খোলে না সিন্দুক, উদ্ধত পাখি সে, উড়ে যায়।
কুন্তলে গ্রীবায় কি পরেছ, জ্যোৎস্নার কোমলতা বুঝি?

—শুয়ে আছো, জ্যোৎস্নার ভিতরে তুমি, জ্যোৎস্নারাতে
শ্মশানে পুড়ছে কাঠ, কেউ পোড়ে অস্থিমাংসসহ।

খুলনার ফটোগ্রাফ

শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী, শ্রদ্ধাস্পদেষু)

ড়ব দীর্ঘ পথ জুড়ে তাঁর দিনের শুরু;—গুরু গুরু করে মেঘ,
আবেগ মিশ্রিত অবেলায় হেঁটে যায় নগর-আক্রান্ত প্রেমিক—
ঠিক আমি জানি না, এরকম বললে হয়তো রাষ্ট্রপ্রধান হেগ
থেকে ফিরবেন যথারীতি। 'বাতি জ্বালাবো কি পথে? দিক-
সীমানা সত্যি ভুলে গেছেন? উত্তরে রাজা রাজেন্দ্রলাল,
মজাখাল দক্ষিণে নয়। বাম হাতে পোস্টাপিস; নাক বরাবর
রহিম ওস্তাগর!'— একমাত্র দুপুর ছাড়া সন্ধ্যায় কি সকাল
আমি লুফে নিই শহরের সব জানু অলিগলি! সকল প্রহর
মোর ঠোঁটস্থ এই— বলা ভালো, কোথায় 'দ্বিজেনবাবুর পুরানো
কুড়ানো ছাপাখানা, কোথায় বাণভট্টের প্রতিকৃতি, কোথায় মানিক
বাঁড়ুজ্জ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন বাংলায়'—সব হারানো
স্মৃতি তাঁর ঝুলে আছে দীর্ঘ নখে-চুলে। হয়তো খানিক
বাদে পাওয়া যাবে ঝুলন্ত ব্যাগের মাঝে খুলনার অম্লান
ফটোগ্রাফ। সেখানে ছড়ানো আছে হাঁটি-হাঁটি শিশুটির মুখ,
বুক ভরা জল নিয়ে একজন সলজ্জ দাঁড়িয়ে। পান
খান রাঙা ঠোঁটে। পিতার ঝাপসা চোখের চশমার মতো সুখ
লেপটে আছে আর পেছনে তিনসারি শুভ্র হাঁস, দুই একটা সুপুরি,
খুপড়ির মতো চালাঘর, পায়রা, আলনায় নিরিবিলি শাড়ি,
সোয়ারী যায় পালকীর তালে, কপালে কী আছে, হয়তো কুড়ি
বছর বয়সের আগেই সাত পাঁচ ভেবে একদিন পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে কলকাতার
ভারী
গাড়ি চড়ে চলে আসেন একা, একলা!—"বেলা
অবেলা এখন কাটে কি তাঁর মোহন পংক্তিতে?"—অথচ জন্ম থেকে
আমিতো এরকম অভ্যস্ত নই!—বুঝি তাই খেলা
সাঙ্গ করি বেঘোরে করিডোরে কমলকুমার মজুমদারে আর দেবব্রত রৈবিকে!

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যরাতের সওয়ার

মাঝরাতে আস্তাবলে ঘোড়াগুলো নড়ে-চড়ে ওঠে। থামে থামে নাচের আওয়াজ ঘুরে ঘুরে বাজে। বারান্দায় দেয়ালে দেয়ালে বাঘের মুখ। বহুদূর থেকে হাওয়া ছুটে আসে। ঝাড়বাতির টুং টাং। কে? কিসের আওয়াজ?

বহুদিন পরে কোন ঘোড়সওয়ার চুরি করে ঘোড়া নিয়ে দূর থেকে দূরে, এই বাড়ি, এই ঘর, বারান্দা বৈঠকখানা···আবার কোথাও চলে যাবে···

আস্তাবলে ঘোড়াগুলো টগবগিয়ে ওঠে। মনে হয়, আমিও কি যাবো। লাল লাগাম হাতে নিয়ে। জামা···জুতো পরে, লাল নীল মাছ কাচের বাক্সে রেখে, শয্যায় বরফ কুঁচি ফেলে। জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি। দাঁড়াও, দাঁড়াও। ছাখো, আস্তাবলে আর একজন ঘুমভাঙা সওয়ার।···কিন্তু যাবেটা কোথায়? আলমারির বইগুলো দৈত্যের দাঁতগুলো মাঝরাতে গা শিরশির গা শিরশির হাসি। সারা বাড়ি জুড়ে মদের বোতল আর কাচের গেলাস ভেঙে পড়ে। বাদুড়ের ডানা থেকে ঠুংরীর তাল ঘর থেকে ঘরে কেঁপে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে ভোর

বৃষ্টির মধ্যে
আমরা বাড়ি ফিরছিলুম
গতরাতের নেশা নিয়ে
আসছে কালের ঘুম নিয়ে
সাদা খরগোশ নিয়ে
লাল ঘোড়ার লাগাম নিয়ে
বুকের মধ্যে যে যার ঘরবাড়ি নিয়ে

হঠাৎ বিস্ফোরণ—
পথ রইল না
আমরাও বাড়ি ফিরলুম না

হাঁটতে হাঁটতে ভাবলুম
টেবিলের ওপর খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে
পাইপের মধ্যে তামাক ভিজে যাচ্ছে
কেউ বারান্দার আলো জেলে
ব্লাউজের ছিঁড়ে যাওয়া বোতামটা খুঁজছে-
আর আমরা হাঁটছি
আর হাঁটতে হাঁটতে ভোর হচ্ছে—

আবদুস সামাদ্

গার্হস্থ্য সোয়েটার এবং শীত

ষমজ কুক্ষণে তুমি ঘর তুলছো চক্ষের নিমেষে
উঠোনে কদম ফুল ফোটে
বস্তুত শীতের মাসে অমনি উষ্ণ ঘরেরই দরকার
ফুলেরও দরকার,
তোমার কোলের ফাঁকে লেপ্‌টে রয়েছে
কামুক উলের সংসার ;
উলের বসন বুঝি এভাবেই বোনা হয়
আবেগে আবেশে ভালোবেসে।

মনোযোগী ভঙ্গিমায় বসে আছ তুমি
আর ব্যতিব্যস্ত কয়েকটি আঙুল
হাতের ভিতরে আছে উলের ঘরানা, কাঠি দুটি
ঠোঁট চুমাচুমি করে, তুমি হাতে হাঁটো, ঝরে
আঙুলে নিবিড় অনুরাগ,
গৃহস্থের সোয়েটার এইরকম,
সময়ের নরম সোহাগ—
আমি তাই গায়ে দিই, আমি, আর্ত শীতের পুরুষ।

তবু কেন শীত করে! বুকের গভীরে কেন
শীত থেকে যায়?
পাঁজরের অস্থি দিয়ে ঘেরা এই বুকের খাঁচায়
যেখানে প্রেমের জন্ম (এবং মৃত্যুও যেইখানে)
সে জানে মাপের বেলা তুমি কিছু ত্রুটি করেছিলে।

বুকের উপর থেকে মাপ নিলে মূঢ় যুবতী হে,
বুকের গভীরে তাই চিরকাল শীত থেকে যায়।

মাসানজোরে একদিন

এইখানে শুয়ে আছে একজন বিষণ্ণ যুবতী
দূরের শহর থেকে তবু রোজ কিছু কিছু মনমরা মানুষ
তারই লোভে ছুটে আসে। ঘুরে ফিরে তার
সবুজ আঁচলে ঢাকা স্তনের পাহাড়
দেখে বলে : আহারে! আহারে!
ছায়াচ্ছন্ন মায়াময় এ রকম সুন্দর পাহাড়ে
মরে যেতে ইচ্ছে হয়। মানুষ বোঝে না
এই রম্য বনস্থলী, মোহন বাতাস, এই সূর্যকরোজ্জ্বল
মাঘের দুপুর তার কেউ নয়। নিজস্ব বিষাদে
এইখানে শুয়ে আছে একজন বিষণ্ণ যুবতী।

তুমি কার পা-তলায় হাঁটু ভেঙে বসেছ প্রেমিক
ছায়া-তৃপ্তি-নির্জনতা দু'দণ্ডের শান্তি অভিলাষী
জেনে রেখো ও তোমাকে কিছুই দেবে না।
ঝাঁঝালো মাংস খেয়ে তুমি যার পরিচ্ছন্ন সবুজ আঁচলে
মুখ মুছে গেলে তার যৌবন দেখেছো,
দাঁতে খড়কে কাঠি নিয়ে হেঁটে গেছ গিরিবর্ত্ম বেয়ে—
আর তুমি নিসর্গ প্রেমিক ওহে শহরের লোক
ইঁটের উনুন ভস্ম চুষে-খাওয়া হাড়গোড় হাঁসের পালক
এই শেষ উপহার দিয়ে গেলে

তাকিয়ে ছাখো নি ওর বুকে
বন্দী জলের প্রেম বাঁধের পাষাণে মাথা ঠুকে
অন্ধ আবেগে কাঁদে! যুবতী নদীর
সাগরসঙ্গমলিপ্সা মানুষের নির্মিত বাধায়
মাথা কুটে মরে।

সবাই এসেছে মুছে ক্লান্তি দুঃখ বিষাদের মুখ

সবাই তোমার কাছে ঋণী,
ময়ূরাক্ষী তোর জলে আমি কোনো বিষাদ রাখিনি ;

আমার বুকেও কাঁদে বন্দী ভালোবাসা
আমার বুকেও আছে মাসানজোর বাঁধ।

অজিত বাইরী

তুমি, তোমার প্রেমিক, প্রবঞ্চক ও শিশু

সহস্র স্তাবকের ভিড়ে তুমি উন্মুক্ত করে দাও ডালিম—
প্রবঞ্চক ও প্রেমিক জরিপ করছে তোমাকে চোখ আর
জিহ্বার নিপুণ ব্যবহারে , রক্তিম ফল নিকড়ে
নিচ্ছে কেউ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অমত্ত মধু, কেউ-বা মদ ;
আর তোমার শিশু, শুষ্ক মুখের কঠিন প্রশ্নে
চৌকাঠে মাথা রেখে ওই নিশ্চুপ ঘুমিয়ে পড়েছে।

বৌঠানের মুখ

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াই : বেতারে কণিকার কণ্ঠ।
সন্ধ্যার হাওয়া এলোমেলো, কানে সুরের রেশ।
হাঁটতে হাঁটতে বসন্ত-রাতে
চিরবসন্তের কবি, দু'হাতে দোলান
শ্যামল গাছগাছালির মাথার ওপর দোল-পূর্ণিমার চাঁদ।
সরোবরে ভাসমান থরোথরো শরীর।
হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াই : হারানো সুর বাজে
কাঙাল করেছো আমায় কাঙাল—
বুকের ভেতর স্মরণ-সুখ, স্মৃতি-সুধা ঝরে।
পথের বাঁকে থমকে থেকে হঠাৎ দেখি ও-যে
দু'সারি গাছের ফাঁকে

আধখানা মুখ লুকিয়ে আছে, আলতো রঙে
রেখার টানে জড়িয়ে আছে লতার বিতানে
বৌঠানের মুখ ; চুলের বর্ণে
মেশে, পাতার আঁধার ; ঠোঁটের রেখায় জ্যোৎস্না তরল কাঁপে।

কৃষ্ণা বসু

কবিতার কাছ থেকে

কবিতার কাছ থেকে সরে গেছি বহু দূরে, তাই তুই আমাকে চাস না আর,
তোর একান্ত ভুবন দুলে ওঠে মোহন মুদ্রায়, নাচঘর, বাতাবি নেবুর গন্ধ,
পরাক্রান্ত মোহ নিয়ে জীবন রঙিন রেলের গাড়ি, নীল জ্যোৎস্নার বুক চিরে
ছুটে যায় গূঢ় এরোপ্লেন, সকালবেলার নদী, টলমল নৌকার উপর
অনারব্ধ সোনালী পিকনিক্,— এই সব ফেলে আমি চলে গেছি দূরে,—
অনায়াস একা একা যাওয়া ! এই যাওয়া কতখানি বিঁধেছিল তোকে ?
তুই কি বৃক্ষের স্বভাব থেকে নেমে, একবার ঘন অন্বেষণে, খুঁজেছিস
কেন এই সরে যাওয়া ? কবিতার কাছ থেকে এই নিম্নাচার ! এই পলায়ন !
তোর বুকে ঘুণপোকা, তোর বুকে হনন-প্রবণ রোগ, তোর মন জুড়ে শীতকাতরতা।
এই নিয়ে বুনেছিস বিস্বাদ জীবন ; তাই এই চলে যাওয়া,—
সুদূর হাঁসের মত, যাযাবরী বেদেনীর মত এই ভ্রাম্যমাণতা আমার !
কবিতার কাছ থেকে কত দূরে যাবে তুমি ? অসমাপ্ত সিংহাসন
ভাঙাচোরা সময়ের কাছে শুয়ে আছে, সেইখানে বসেছিলে একবার ! মনে নেই ?
মনে নেই অভিশাপ বেজেছিল সাপুড়ে বাতাসে
হিস্ হিস্ ফণা তুলে দিয়েছে গভীর ক্ষত
সেই বিষ, সেই সংক্রমণ জড়িয়েছে জীবন পরিধি।
কবিতার কাছ থেকে কতদূরে যাবি তুই ? কবিতা মাকড়সা ফাঁদ
পাতা আছে জীবন ব্যাপার জুড়ে, কাঠামো অবধি
তাকে ফেলে তাকে ভুলে কতদূর যাবি ?

ত্যক্ত মাস্তুলের পাশে সমুদ্রের স্মৃতি

নৃপতি-বিহীন তরবারি ম্রিয়মাণ পড়ে আছে খাপে
সুখ ও দুঃখের অতীত কোনো সময়ের সহর্ষ প্রতিবেশী হয়ে, হায় !
এখন কি জেগে ওঠা যায় ?
এমন ব্যবহার বিহীন শোক—
পরিত্যক্ত মাস্তুলের কাছে পড়ে আছে সমুদ্রের স্মৃতি,—
ধূপ কিছু কাতরতা নিয়ে নম্র রমণীর লাল করতল ছুঁয়ে,
উঠে গেছে অনায়াস মধ্য যামের দিকে,
ঘোরানো সিঁড়ির থেকে নেমে আসে
আভিজাত্যের
লোহিত
কার্পেট !
ক্যানো ছবিতে আবদ্ধ আছ, হে তুরঙ্গ, তন্ময় তুর্কী ?
নেমে এসো ছবি থেকে ; নৃপতি-বিহীন তরবারি
পড়ে আছে ব্যবহার হীন, ত্যক্ত মাস্তুলের পাশে,
জাগিয়ে দাও একবার বিপরীত তরঙ্গের অভিচার,
—স্মৃতি ।

মৃত্যুঞ্জয় সেন

কতকগুলি শব্দ

কতকগুলি শব্দ পরস্পর পীড়া দিয়ে আসছে
কাঁটা চামচের মত অসাবধান সেগুলি
শব্দগুলির বিশুদ্ধতা কম
সেগুলি লোভে বড় ভক্ত, একটুও গান নেই।
শব্দগুলি ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে— সব এক
না না না না— সব না
শব্দগুলির বয়সের জলবায়ুই প্রৌঢ়

এই শব্দগুলি একদা আসিত
গান গাহিত, ভালবাসিত
শব্দগুলি কোনো জড়তা, সংস্কার মানিত না
শব্দগুলি বরাবর প্রৌঢ় ছিলো না
শব্দগুলিকে অনেক দিন যাবৎ চিনি
শব্দগুলি আমার তপোবন ছিলো

শব্দগুলি বড় বিশ্রী, হতশ্রী, বিগতশ্রী
শব্দগুলিতে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই
শব্দগুলিতে শুধু না না না না

এটা একটা

এটা একটা • • স্কুল
এটা একটা কলেজ
এটা একটা ইউনিভারসিটি
এটা একটা আলাপ
এটা একটা প্রেম
এটা একটা চাকরির দরখাস্ত
এটা একটা ইণ্টারভিউ
এটা একটা রিগ্রেট লেটার
এটা একটা মদের দোকান
এটা একটা লেক
এটা একটা সন্ধ্যা বা রাত্রি
এটা একটা আনন্দ বা বেদনা
এটা একটা স্বপ্নশেষ
এটা একটা মৃতদেহ
এটা একটা কাহিনীচিত্র

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

নারী

পৃথিবীর মাঠ, ঘাট, বৃক্ষের ডালপালা,
নদীর চিবুক ছুঁয়ে ক্রমাগত মেয়েলী শরীর
কোমল স্বপ্ন আনে উষ্ণ নীড়ের—
তার সোনালী, সোনালী নীড়,
মন্ত্রমুগ্ধ দিন।

যাবতীয় গৃহস্থালির সম্ভার চড়ুয়ের মত
মুখে নিয়ে বসে থাকে আবিষ্ট মোহের ভেতরে,
নাবালিকা অভিমান বয়সের জলে ধুয়ে যায়…
অস্তিত্ব-সর্বস্ব আঙুলে জীবনের অনুবাদ
কেটে কুটে লেখে :

বিকেলের আলো জ্বলে শস্যের ক্ষেতে ;
ফুল ফোটে, ঝরে যায় নব পাতা, হলুদ, প্রাচীন।

পৌরুষই নির্ভর-আশ্রয়

ওভাবে ভুবন-ভোলানো নামে আমায় ডেকোনা :
আমি তোমার ভুবনমোহিনী নারী নই,
ওভাবে আকুল চিৎকারে আকাশ ভেঙোনা !

আমার প্রণয়প্রার্থী হতে চেয়োনা পুরুষ,
প্রণয়ের আগে পৌরুষে জয়ী হও,
যোগ্য হয়ে ওঠ,
পৌরুষই পুরুষের প্রেম !

তোমার প্রখর যোগ্যতায় জিতে নাও নারীর হৃদয় :
ভালোবাসা আশ্রয়হীন হয়ে বাঁচেনা কখনো,
তুমি তাকে নির্ভয় আশ্রয় দাও !
ওভাবে বিলাপ ছড়িয়ে নারীর অঞ্জলি নেবে
স্নবুদ্ধি বালকের মত ?

তার চেয়ে মূর্খতা নেই,
তার চেয়ে মরে-যাওয়া ভালো,
নিঃস্বতায় কিছুই মেলে না,
পৌরুষে যোগ্য হও, পৌরুষই পুরুষের প্রেম !

অজয় নাগ

ঘুমের মধ্যে খুন

আমি সময়স্বপ্ন দেখিনা···আমি ঘুমের মধ্যে খুন হই চেনা অথচ অজানা আততায়ীর ভোজালিতে। আমার ভিতরটা সদাসতর্ক টান্ টান্ আবছায়া··· প্রতিদিন দু'বেলা রঙ সাজিয়ে ফেরিওয়ালা ফেরে, লোভ হয় তবু ইচ্ছা করে না। চোখে দুলে ওঠে কবিত

শস্যক্ষেতের শুধুমাত্র ঘাম···হাতের তালু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কী আশ্চর্য উপায়ে
নিটোল পাথুরে জমিতে জুঁই গাছটা বেড়ে ওঠে সূর্য ছাড়াই অসম্ভব পরিপুষ্ট
যুবতীর সর্বাঙ্গ মুক্ত পল্লবে ; তবু জানি কোনোদিন সে ফুল ঝরাবে না···
টলমলে ফুটন্ত বন্ধ্যা শরীর কোনোদিন কাঁদতে পারবে না।
বেলা শেষে রক্তাক্ত রাস্তায় পাগল যায় ঘণ্টা বাজিয়ে। আমি তাকে থামতে বলতে
পারিনা থামাতে গিয়েই। আমার জাগরণে ক্লান্তি নামে—আমার ঘুম পায়···
সেই সময়েই অজানা আততায়ী···অথচ আমি কোনোদিন (বিশ্বাস কর তোমরা)
স্বপ্ন দেখিনা···একান্ত আত্মছবি আঁকি না।

মধ্যরাত ঃ দুই

উৎসব ঝুমঝুমি মধ্যরাতে বাজে
মগজরক্তের স্রোত লোহিত কণার
হেঁটে যায় প্রতিদিন জন্মের ওপারে
ভিতরের চোখ বন্ধ শুধু মাঝে মাঝে
চর্ম চোখ খুলে যায় ঠোঁটে জাগে সাড়া
হাতের ডাইরি লেখা হয় চুপিসারে—
'হৃৎপিণ্ডের মাকড় সুখ খুঁটে খায়
তারপর মোহময় কব্জি খসে যায়।'
মধ্যরাতে একা ঘরে নিছক মানুষ
দেহে দেহ প্রাণে প্রাণ ম্লান হয়ে পড়ে
দন্তহীন মাড়ি হাসে— বহ্নিমান তুষ
উত্তর দক্ষিণে যায় দক্ষিণ উত্তরে
ভাঙা মাঠে ঝড় ওঠে বিস্মৃত ইথারে
প্রেম ঘৃণা একাকার করোটি ও হাড়ে।

ব্রততী বিশ্বাস

বুকের মধ্যে পদ্ম নেই

বুকের মধ্যে পেরেক
পদ্ম নয়
সূর্যাস্ত প্রবেশ করেনি— একটু দেরি আছে তার প্রসাধন মুহূর্তের
ঈশ্বর নই কিংবা ডাকাত
আমাকে নষ্ট করেছে আমার প্রতিবেশী
মুখোশ পরে সারাদিন লোভার্ত পোশাকে
বসতবাড়িতে তুলেছে ঘুঘুর ডাক
শস্যক্ষেতে ইঁদুরের দাঁতের করাত

শৈশবের জলাশয় চুরি হ'য়ে গেছে প্রথম সকালে
রোদ্দুর বাড়ন্ত যখন
ত্রিসীমানায় কাঁটাতার তুলেছে অর্গল
অলক্ষ্মীর পাঁচালীর পাতা গোপন কুলুঙ্গীতে
শিকারী চিল অতর্কিতে নিয়ে গেছে অবশিষ্ট শঙ্খসাদা কড়ি
হাততালির শব্দে উড়েছে ফানুস প্রতিবেশীর বাগানে
অলিন্দ বাতিদানবিহীন
বুকের মধ্যে উথালপাথাল জল নেই
কুসুমসুবাসিত সময় কব্জা করেছে প্রতিবেশীর প্রাসাদ
সুতরাং ফুলের প্রতিদ্বন্দ্বী আমি
স্বেচ্ছায় ডেকেছি অস্তরাগ

অবিকল সূর্য অস্তিমসুখে বিভোর
টলমল পদ্মপাতা নয়
পদ্ম নয়
এখন আমার বুকে ফুটে আছে শাণিত পেরেক।

শিল্পের শ্যাওলায়

সেদিন সে নেমে যাবে গিরিকন্দরে
শিল্পের শ্যাওলায়
ডুবে যাবে তার শীর্ণগ্রীবা
স্বপ্নঝিনুক শিশুকাল হৃৎপিণ্ডে বাজাবে দামামা।
এই তার সাধ
তাকে নিয়ে কানাকানি অর্থহীন প্রলাপ
বাতাস রটাবে চতুর্দিক
এই তার মন
নদীর মতন উপলখণ্ডে বাধা পাবে
স্বপ্নের বলয় ভেঙে যাবে বার বার
চুরি হবে সোনালী ফসলের ক্ষেত
জমিতে আগাছা ক্রমশ
প্রাচীর আড়াল ক'রে
নির্বাসন দণ্ড দেবে অনায়াসে

এই তার সুখ
শিল্পকুসুমের স্তব
তাকে মানাবে না জেনে
সে পৃষ্ঠে নেবে শাণিত চাবুক

গভীর অসুখের রাতে
বান্ধব ছায়া গোপন দোসরের মতো
সরে যাবে ক্রমশ তফাতে।

সুরজিৎ ঘোষ

অসামাজিক

আমরা দু'জনে থাকি বসবার ঘরে থাকে তিনটে চেয়ার
কখন অতিথি এলে ব্যবহার হবে বলে চুপচাপ শূন্য সেজে থাকে
কেউ কারো আত্মীয় হয় না। শুধু যারা যারা এসে বসে
তাদের ওজন মতো কাৎ হয়, হেলে পড়ে, আনন্দে প্রগল্‌ভ দুলে ওঠে
আর যখন সপ্তাহব্যাপী ব্যস্ত থাকি নিজেদের বাগানের কাজে
গৃহিণী সমুদ্র হয়ে আনাচ কানাচ ভ'রে রাখে
বহুদিন বাইরে যাই না ; বাইরে থেকে মানুষ কী সৌহার্দ্য আসে না.
তখন গভীর রাতে কারা যেন জড়ো হয় বসবার ঘরে,
সকলে জায়গা পায় না কেউ কেউ মেঝের ওপরে জোড়াসন
কেটে বসে, শুরু হয় ফিস্‌ফিস্‌ গম্ভীর আলাপ।

সকালে দরজা খুলে ঢুকে দেখি, দু'জন চেয়ার খুব গলাগলি
বসে আছে, তৃতীয়টি জানলার ধারে মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরে
যেন গতরাতে সভাশেষে এ'রকম অবস্থান সাব্যস্ত হয়েছে।

যতক্ষণ সময় ফুরায়

'এইসব মরা পাতা কোনদিন মাঠ থেকে তোলা হবে ?
প্রথম কুয়াশা ভাসা এবারের সন্ধ্যার বুকের ওপরে
একরাশ হলুদ বিবর্ণতা জড়ো ক'রে পড়ে আছে এরা।'

এই অন্তিমে কোন কাজ নেই আমরা দুজন তাই পায়ে পায়ে এসে
এই সব শুকনো পাতার পাশে দাঁড়ালাম, হঠাৎ কখনো মুখ তুলে
যেই তাকিয়েছি দেখি অন্ধকার ছায়াচ্ছন্নতায়
মুখের এতোটা বেশী গ্রহণ লাগার মতো খেয়ে গেছে
দুজনেই অপরিচয়ে র'য়ে গেছে দুজনের কাছে।
তখন বেদনা নেই দীর্ঘ ব্যবধানে এসে দুজনে মেলার,
আনন্দও নেই কোন হঠাৎ উপচে আসা চোখের জলের
দুজন অপরিচিত হেঁটে হেঁটে শুধু এই পৃথিবীর এককোণে
ম্রিয়মাণ হলুদ পত্রাবলী কি ভাবে থাকবে এই ভেবে
এ ওকে প্রশ্ন করি যতক্ষণ সময় ফুরায়।

মঞ্জুভাষ মিত্র

রূপেশ্বরজী এইভাবে কথা বলতেন

রূপেশ্বরজী বলতেন,
কখনো নিরাশ হোয়োনা একদিন তুমি সফল হবেই—
আদর্শ অনুযায়ী তন্ময়ভাবে কাজ করে যাও একটুও সরে এসো না।

দুঃখের দিনে ভেঙে প'ড়ো না। বরং সমস্ত কর্কশতা,
ক্লান্তি, জ্বালা ও গ্লানিগুলোকে অলংকারের মত নেড়েচেড়ে
দেখ। যে বাঁকা দ্যুতি দেখছ তা আসলে শুভেরই সংকেত
দুঃখের পর সুখ আসবেই ভ্রমণের পর যেমন বিরাম।

মানুষকে ভালোবেসো, কারো নিন্দা কোরোনা কিন্তু যাদের ভালো লাগবে না তাদের কাছ থেকে নিঃশব্দে সরে এসো। অতিরিক্ত মানুষ মানেই একধরনের অপচয় যা সাধনার থেকে সরিয়ে আনে।

সময় হচ্ছে এক অদ্ভুত পাথর যা প্রগাঢ় পরিশ্রমে রত্নে পরিণত হয়, নইলে সামান্য প্রস্তরমাত্র। অতএব সময় সর্বদা পরিপূর্ণ ও সবলভাবে ব্যবহৃত হোক।

যদি শিল্পী হতে চাও অসহ্য অপমানসমূহ পেতে হবে। অপমান ছাড়া শিল্পী হওয়া যায় না। ওই দেখ তিতো নিমফুলগুলি তোমার বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল, রেখে গেল মধুরের ছাপ।

সঙ্গীত হ'ল দেবদেবীদের মিলনকালীন একধরনের ধ্বনিমাত্র। তাকে খুব সতর্ক পবিত্র এবং নিরলসভাবে ব্যবহার করতে হবে।

প্রথমে নারীদের কাছে যেতে হয়, তারপর গাছপালা পশু ও ফল সমুদয়ের কাছে, সর্বশেষে গ্রন্থাগারে গ্রন্থসমূহের নিকটে। গ্রন্থাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর এক পবিত্র আনন্দ সর্বদা ঘিরে থাকে, অন্য কোন অভিজ্ঞতার তেমন প্রয়োজন হয় না। এমন কি নারী নামক প্রথমোক্ত বিশেষ ধরনের তনুফাঁসও কুয়াশাবৎ তরল-অবয়ব হয়ে যায়।

রূপেশ্বরজী এইভাবে কথা বলতেন। এক বসন্তের রাতে জ্যোৎস্নার সমুদ্রের দিকে ভেসে গেলেন যেন এক উপদেশরত ফুল।

আমার স্ত্রী

(ব্রেতোঁর অনুসরণে)

আমার স্ত্রী তার ঘনকালো চোখ ও উদ্ধত ভ্রূযুগ্ম নিয়ে
আমার স্ত্রী তার ঘন কালো চুল ও কোমরলম্বিত ঝর্ণা নিয়ে
তার কোমল বাহুযুগল ও বুকের দুটি পূর্ণচাঁদ নিয়ে
শরৎকালের স্বচ্ছ হাসি এবং বর্ষাকালের চোখের জল নিয়ে

আমার স্ত্রী তার শারীরিক চিত্রকলা ভাস্কর্য এবং গ্রন্থসমূহ নিয়ে
আমার স্ত্রী বিশ্বের সমস্ত সংবাদপত্রের ভিতর বহমান সংবাদ নিয়ে
টেলিপ্রিণ্টারের অবিরাম শব্দসমূহ ও ঠোঁটের মনোরম নড়াচড়া নিয়ে
সংবাদপত্রের সম্রাটের সৌজন্যে প্রকাশিত আমার শ্রেষ্ঠ কবিতা নিয়ে

আমার স্ত্রী তাঁর নাভি এবং হস্তীদন্ত-উজ্জ্বল উপত্যকা ঊরু নিয়ে
আমার স্ত্রী তাঁর নখের শশীকলা এবং লালরঙ নিয়ে
তার গ্রীবার সুন্দর তিল এবং নাসার ক্ষুদ্র তিলফুল নিয়ে
তার শরীরের ডিমের কুসুমের মত অনবদ্য ভঙ্গিমা নিয়ে

আমার স্ত্রী তার তিনশো গোলাপ ও একশ পদ্ম নিয়ে
আমার স্ত্রী হাজার স্বর্ণকণ্ঠি ও দু হাজার বুলবুলি নিয়ে
আমার স্ত্রী তার সংখ্যাতীত সৌন্দর্যবাক্স ও আয়না নিয়ে
সেই আয়নায় প্রতিফলিত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিদের মুখ নিয়ে

উদয়ন ভট্টাচার্য

মন্দিরে একদিন

মন্দির ছিলো বন্ধ
কিছু বাকি ছিলো সন্ধ্যার

অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ায় উদাসীন সেই নারী
সম্পর্কের মূল বৃক্ষ ছিন্ন করে বলে বলো আজ
আমি কি পারিনি দিতে
যা পারে তোমার ঐ ঈশ্বরী
সুপ্ত তার অহংকার তখন কুয়াশার মত আড়ালে রাখে মন্দির।

সমস্ত দিন বসেছিলো বালক বালিকারা
কোন উৎসব ছিলো না বলে আজ ভিক্ষে হলো না
পরিত্যক্ত যজ্ঞকাঠের মত শুয়েছিলো অর্ধদগ্ধ কিছু
কোন উৎসব ছিলো না বলে আজ ক্ষুধা হলো

জোয়ারের নদীর মত ক্রুদ্ধ ভেসে গিয়ে ভিখিরির দিকে নারী
দিগ্বিদিক বিদীর্ণ করে বলে এই ভ্যাখো আজ
আমি যা পেরেছি দিতে
পারেনি তোমার ঐ সোনার ঈশ্বরী
ব্যগ্র আকাশের দিকে চোখ সে তার আঁচল থেকে ছড়িয়ে দেয়
ধান এবং মুদ্রা

তখনই খুলে যায় মন্দির

তোমাকে

আমি সে সাম্রাজ্যে লোভ করেছি
তুমি তো তার সেই বিস্তৃতি জানো না
তুমি হাসো, কারও বাড়ি ভেঙে যায় কারও হয় পুনর্নিমাণ
কোন চা বাগানের রমণীর ঝুপড়ীতে নেমে আসে সূর্য
আমরা স্বাভাবিক দাঁড়াই অথচ কুয়াশা এসে মাঝখানে দাঁড়ালে
অন্য পুরুষ এসে ধরে তোমার হাত, পানীয় চায়

তার হাতে অদৃশ্য খুনের লুপ্তঘ্রাণ, তুমি তার সন্ধান জানোনা

যতদিন উদাস থাকো
অহংকারের কাছে নত হয়ে থাকে গোলাপের দৃপ্ত সুখ
যতদিন তুমি কথা রেখেছিলে
শাবক হারানো বাঘিনী থেকে বন্য চিতা আমি মান্য করিনি
আজ আমার এই সাম্রাজ্য লোভ তুমি অনায়াসে শেখো
লোভ ছাড়ো, হাসো, ভাসিয়ে এসো সমাধির ফুল
ভেঙে যাও অদৃশ্য কটাক্ষ এইখানে সবখানি

কোথায় যে লুকিয়েছিলো আলো, বুকের ভেতর
কেউ তো তার সন্ধান জানলো না
তুমি হাসলে সমস্ত ঘর আলোকিত হল
কারও বুকে জ্বলে উঠলো চিতা

অনুরাধা মহাপাত্র

অংকুরের মা

স্ফটিক কৌটোর মত বর্ষার মত ডুবডুব চাঁদ উঠে এল
নদী ভোগবতী থেকে
প্রগাঢ় স্তনে ভাসে দুধের জোয়ার জ্যোৎস্না
থরো থরো পাপড়ি খুলছে প্রথম হাঁটু মুড়ে
কাঁপা কাঁপা জ্যোৎস্নায় ভাঙা অশৌচ হাতে অংকুরের মা
ভেঙে পড়ছে বর্ষার ফুলন্ত গন্ধরাজ তার পাপড়ি ভাঙা পেটের ওপরে
নদীময় নীলাভ কাকাঁল ভেঙে প্রার্থনার মত উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে
অংকুরের ছলপ্রকৃতি মা
স্ফটিক কৌটোর মত ডুবডুব জলপ্রকৃতি চাঁদ জলে টলমল উঠে এল
শ্যাওলা আর অশৌচ পাপড়ি ভাসিয়ে অংকুরের প্রথম
রক্তমেদুর চাঁদভাঙা ঠোঁটে
পাপড়ি খুলছে রক্তমাখা পাপড়ি খুলছে জ্যোৎস্নায়
কাঁকালের নীলাভ নদী নিয়ে উথলে উঠলেন
অংকুরের মা ভোগবতীর পাড় দুলিয়ে
কেবল জলপ্রকৃতি হাঁটুমুড়ে বসে রইল জনহীন অংকুরের শিয়রে !

নিজের ভিতরে নিজে

আমারও সূক্ষ্ম কোন বোধ হয় এঁটে-কাঁটা রক্তের ভিতরে
আধো রোদ, শাদা হিম কয়লার ভিতরে
এক অলৌকিক গাছ ওঠে দেখে
কাঁটাময় নয়, শুধু পোড়া আকাশের দিকে মুখ
কোন এক রক্তবমিমদে ভানা এই শহরের মধ্যরাতে
তার কাঁধে, তেজী পাকা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো কাঁধে

ফুটে ওঠে অলৌকিক আগুনের ফুল
কেউ ভাবে এই শান্তিহীন মৃতশান্তির দেশে
এ এক সন্ত্রাস !
মার্বেল পাথরের ঘরে শুয়ে দুজন শাদা পাথুরে দম্পতি
এই অলৌকিক গাছের উল্লাসে ভয় পায় ! তাদের ভয়ে ও ঘৃণায়
এক বোবা মাংসপিণ্ড নিজের ভিতরে নিজে
খুন হয়, খুন হয়ে হাসে ।

বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়

অন্য কোন্ সমুদ্রের তীরে

এত পাপ, এত রক্তে ভরে আছে আমার স্বদেশ—
সাঁকোর ওপর থেকে হেসে ওঠে বাঁকা চাঁদ, ওঠে তার
মিথ্যার লাবণ্য ছুঁয়ে, মানুষের মেধাবী মস্তিষ্ক শুধু কুরে কুরে খায় ;
এখানে লাগেনা ভালো মনে হয় যাই, কোথায় বা যাবো
জঙ্গল-টঙ্গল, পরবাস, ভিনদেশী নদীর কিনারে আর কতদিন
থাকা যাবে, প্রিয় শহরের থেকে, স্বদেশ পারের থেকে
কতদূর রাখা যাবে আমূল সুদৃঢ় টান
শৈশবের, মায়াবী ক্ষেতের, সূর্যাস্ত শিখার দেশ, ধানশিষ
বিস্তৃত জলার পাশে পানকৌড়ি, বক, দোয়েল গরুর পিঠে—
এইসব চিহ্ন নিয়ে কতআর দূরে থাকা যাবে, সীমান্তে লাবণ্য রেখা
মৃদু হাসি, শুনে এই সুডৌল আরাম, বাঙালী মেয়ের কাছে, মা'র কাছে
কী ভীষণ ঋণী, দুঃখী স্বদেশের ভূমি ছেড়ে, নষ্টনীড় ছেড়ে
অন্যকোন্ সমুদ্রের তীরে গড়া হবে স্বপ্ন ও সমাজ ?

মায়াব্যবহার

জীবনে বসন্ত নেই তবু শালা কবিতায় লিখি, স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা
বারবার কবিতায় আসে, মহিলারা শরীর সর্বস্ব হয়ে ফেটে পড়ে জরায়ুর মতো
শিমুলের লালে হাওয়া দোলে, এইসব উপমাও বহু পুরনো লাগছে।
একজন কবির বিমর্ষতায় সভ্যতার কিছু এসে যায় না, সমাজতান্ত্রিক ধুঁয়ো
ভারতবর্ষের মাটি রঞ্জিত করেছে রক্তে,

তবু ঐ শব্দের আড়ালে কিছু মায়াব্যবহার আছে

হিজড়েব মতো যৌনতাহীন বোধের থেকে এসব হয়েছে, জীবনে বসন্ত নেই

—তবু শালা

কবিতায় এসে যায় মায়াবী সন্ধ্যার কাল, জাহাজের বাঁশী, ঢেউয়ের

ছলাৎ-ছলাৎ

পাড় ভাঙে, ধস্ নামে চতুর্দিকে তবু আমাদের চোখ বিস্মৃতিকে ভালবাসে
চৌরঙ্গীর লাল টিপ, ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে ময়দানে বসে থাকে পুলিশের

টুপিকে এড়িয়ে

সংগমে ঝরে পড়ে রাতের কুয়াশা।

ব্রত চক্রবর্তী

পা

কেবল পা দু'খানি আমার, আর কিচ্ছু নেই ;
পা দু'খানি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াবো এই পৃথিবীতে।
বন্ধুর বাড়ি গিয়ে চেয়েছিলুম কবিতার বই, বন্ধু দিলো না ;
আমি তখন বন্ধুকে অবাক ক'রে, হাসতে হাসতে গিয়ে দাঁড়ালুম
সেই বইয়ের ভেতর ; কবিসভায় গিয়ে একদিন—
আমি ছুটিয়ে ছিলুম আমার পরিশ্রমের, ক্লান্তির, আর্তির-পা দুখানি,
সন্ত্রস্ত ও সচকিত কবিরা তখন থামিয়ে দিলো কবিতা পাঠ ও আলোচনা
আমি যেতে চেয়েছিলুম রোম, প্যারিস ও হল্যাণ্ড, ধর্মসভায় গিয়ে
আমি ব'লেছিলুম— বেঁচে থাকাটাই একমাত্র ধর্ম,

কেউ শোনে নি ; সকলেই জিভ থেকে, কন্নুই থেকে ছুঁড়েছিলো
অবিশ্বাসের পাথর, সকলেই দার্শনিকতার ঠাণ্ডা তীর ছুঁড়ে
ব'লেছিলো, 'চুপ ! কথাটি নয় !'…

আমি কিন্তু সর্বত্র গিয়েছি, সমস্ত শুনেছি আমি পা— দু'খানি নিয়ে ।
কেবল পা-দু'খানি আমার, আর কিচ্ছু নেই ; বুদ্ধি ও মনন দিয়ে,
মেধা ও অনুসন্ধিৎসা দিয়ে, তিলতিল পরিশ্রমে আমি
তৈরী ক'রেছি পা-দু'খানি ; জানি, অই পা-দু'খানি নিয়ে আমি
একদিন হাসতে হাসতে আমার মৃত্যুকেও অতিক্রম ক'রে চ'লে যাবো ।

পেরেক

একদিন সাত সকালে হাতুড়ী এসে হাজির হ'লো তার বাড়িতে ।
এসে, কোনোকিছু না ব'লেই, এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করলো তাকে ।
পেরেক তো অবাক, কিন্তু হাতুড়ী তাকে আরো অবাক ক'রে,
মারতে মারতে, একটা বোবা ও সাদা দেওয়ালের সঙ্গে আটকে দিয়ে
গট্‌মট গট্‌মট ক'রতে ক'রতে, কোথায় কোন দিকে যেন চ'লে গেলো !

সেই পেরেক, আহত ও বিস্মিত চোখ তুলে সে দেখলো—
ঠিক এরপরেই সে মূল্যবান হ'য়ে উঠেছে সংসারে ;
তাকে নিয়ে আলোচনা শুরু ক'রেছে মানুষ ; আর সেই হাতুড়ী,
সে তখন শহরের একটি চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে পড়ছে
খবরের কাগজ, পড়ছে অনেকদিন পরে ঘুম থেকে জেগে ওঠা
একটি পেরেকের কবিতা ·

একটি পেরেক, আঘাতের পরে, ঠিক এইভাবে মূল্যবান হ'য়ে উঠলো !…